ষষ্ঠ অধ্যায়

গণনাট্য সংঘের সংগঠন ও নাট্যচর্চা : শিল্প-রাজনীতির দ্বন্দ্ব

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আবির্ভাব হয়েছিল বাংলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অস্থির সময়ে। দুর্ভিক্ষ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ফ্যাসিবাদের রণহুঙ্কারকে প্রতিহত করে গণনাট্য সংঘ শ্রমিক-কৃষক-সর্বহারার সমানাধিকারের বাণী ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। আবার স্বাধীনোত্তর সময়ে বাংলার বুকে ঘটে চলা রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ঘটনাক্রমকে যথার্থভাবে চিহ্নিত করা এবং তার প্রেক্ষিতে নবজাগ্রত জনতার সমাজ বদলের আহ্বানকে শিল্পিত রূপ দেওয়ার দায়িত্ব গণনাট্য সংঘ গ্রহণ করেছিল। যার সার্বিক ইতিহাস আমরা পূর্ব অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করেছি।

একই সঙ্গে আমাদের গবেষণার আলোচ্য সময়কালে (১৯৪৩-৬৫ খ্রি) গণনাট্য সংঘকে নিয়ে বিভিন্ন সময়ে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বিশেষত রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে শিল্পচেতনার সুষম মিলনের মাধ্যমে কীভাবে নাটককে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার করে তুলতে হবে, সেই বিতর্কের কোনো সমাধান আবিষ্কার করা যায়নি। গণনাট্যের আদর্শের প্রতি বিরূপ নাট্যদল ও ব্যক্তিত্বরা সংঘের একপাক্ষিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ক্রমাগত প্রশ্নচিহ্ন তুলেছে। অন্যদিকে জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত রাষ্ট্রশক্তিও চুপচাপ বসে ছিল না। সংঘের মাধ্যমে ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের উত্থানকে প্রতিহত করার জন্য রাষ্ট্রব্যবস্থা 'নাট্য নিয়ন্ত্রণ আইন' ব্যবহারের পাশাপাশি সরাসরি আক্রমণ করতেও পিছ-পা হয়নি। আবার গণনাট্যের শিল্পী-তাত্ত্বিকদের রচিত সংঘের ইতিহাস অনেকক্ষেত্রে এক রঙে রাঙানো, যেখানে সংঘের সাফল্যমণ্ডিত উজ্জ্বল মুখটির সামনে ব্যর্থতা ও দুর্বলতার খতিয়ান চাপা পড়ে গেছে। তবে তাঁরাও সংঘের শিল্পচর্চার একপাক্ষিক প্রবণতার জন্য অতিরিক্ত রাজনীতি নির্ভরতাকে দায়ী করেছেন। রাজনীতি বলতে এখানে যেমন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির হস্তক্ষেপের কথা বোঝানো হয়েছে, তেমনই শিল্পীদের মধ্যে বামপন্থী আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতাপ্রসূত নাট্যচেতনাকেও বোঝানো হয়েছে।

ফলে রাজনৈতিক ও শৈল্পিক মতাদর্শগত পার্থক্যের জন্য একাধিকবার সংঘে ভাঙন ধরেছে; সংঘের প্রথিতযশা শিল্পীদের বহিষ্কার করা হয়েছে বা তাঁরা দলত্যাগ করেছেন। অন্যদিকে গণনাট্য সংঘও শিল্পনির্মাণের ক্ষেত্রে তার মূল আদর্শের প্রতি একাত্ম থাকতে পারেনি। শ্রেণি সংগ্রামের বাণী 'গণ'-এর কাছে নিয়ে যাওয়ার তাত্ত্বিক দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য এসেছে কিংবা গণশিল্পের রূপ-নির্মাণ

নিয়ে বিভ্রান্ত হয়েছে। ১৯৬৫ সালের আগে পর্যন্ত গণনাট্য সংঘ প্রত্যক্ষভাবে কমিউনিস্ট পার্টির শাখা সংগঠন ছিল না। অথচ বিভিন্ন বিষয়ে পার্টির হস্তক্ষেপ বা পার্টি মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা সংঘের কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করেছে। গণনাট্য সংঘের সূচনালগ্নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী-সংগঠক চিন্মোহন সেহানবীশ পরবর্তীকালের এক সাক্ষাৎকারে অত্যন্ত খেদের সঙ্গে এদেশে 'গণনাট্য আন্দোলন'-এর বিপুল সম্ভাবনা নষ্ট হওয়ার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির ভুলভ্রান্তিকে দায়ী করেছিলেন।[১] আবার শিল্পীরাও আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে নাটকের শিল্পগুণকে গৌণ করে ফেলেছিলেন। যা গণনাট্য সংঘকে তার নিজস্ব আদর্শের কক্ষপথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। একই সময়ে সংঘের নাট্য-চেতনার প্রতিস্পর্ধী একাধিক নাট্য-আন্দোলনের জন্ম হয়। এমনকি 'গণনাট্য আন্দোলন'-এর প্রকৃত উত্তরাধিকারী কারা সেই নিয়েও বিতর্ক শুরু হয়। ১৯৬৫ সালের পর গণনাট্য সংঘ সরাসরি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্কসবাদী) শাখা সংগঠন রূপে কাজ শুরু করে। স্পষ্টতই যে মহান উদ্দেশ্য নিয়ে গণনাট্য সংঘের যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল, তা ক্রমে একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি কর্তব্যপালনের মাধ্যম হয়ে ওঠে। যার বীজ লুকিয়েছিল আমাদের আলোচ্য সময়কালে সংঘের নাট্যচর্চার পদ্ধতি ও সংগঠনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে। এই অধ্যায়ে আমরা গণনাট্যে সংঘের সাংগঠনিক ও নাট্যচেতনার সঙ্গে যুক্ত শিল্প-রাজনীতির দ্বন্দ্বের বহুরৈখিক বিষয়টি আলোচনা করব।

পার্টি বনাম সংঘ—সাংগঠনিক :

১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ভারতীয় গণনাট্য সংঘ নিজেকে কখনও কমিউনিস্ট পার্টির শাখা সংগঠন বলে দাবি করেনি। এমনকি কমিউনিস্ট পার্টির 'ঝুটা স্বাধীনতা'র প্রভাবে সংঘের মধ্যে যখন ভাঙনের খেলা চলছে, তখনও সংঘ নিজেকে দল-নিরপেক্ষ বলে দাবি করেছে। তার দশ বছর পরে ১৯৫৭-র অষ্টম সম্মেলনে যে-কোনো রাজনৈতিক আদর্শের প্রতি দায়বদ্ধতা অস্বীকার করে সকলের জন্য গণনাট্যের প্রাঙ্গণ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। অথচ স্বাধীন ভারতের প্রতিটি সাধারণ নির্বাচনেই গণনাট্য

সংঘ কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে প্রচার করেছে। ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও, সাধারণ জনতা গণনাট্য সংঘকে পার্টির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ রূপেই দেখেছিল।[২] হেমাঙ্গ বিশ্বাসও বলছেন যে গণনাট্য সংঘ কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক শাখা না কমিউনিস্ট শিল্পীদের নেতৃত্বে গণপ্রতিষ্ঠান, সেই প্রশ্ন বারবার ঘুরে এসেছে।[৩]

সংঘের প্রতিষ্ঠালগ্নে কমিউনিস্ট পার্টি সরাসরি যুক্ত না থাকলেও পার্টির সর্বভারতীয় সম্পাদক পি সি যোশী ছিলেন সংঘের সমস্ত কাজকর্মের প্রধান উদ্যোগী। তিনি চেয়েছিলেন ভালো নাটক করে সুদূরপ্রসারী প্রভাব সৃষ্টি করতে। যে নাটকে কমিউনিস্টদের জয়গান থাকবে, শ্রমিক-কৃষকের মিলিত অগ্রগতি থাকবে, লোকসংস্কৃতিকে যথার্থ মর্যাদা দেওয়া হবে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যপূরণ করার জন্য তিনি গণনাট্য সংঘকে ভারতব্যাপী ছড়িয়ে না দিয়ে বোম্বাই-কলকাতার মতো বড়ো শহরে একত্রিত করেছিলেন। শহুরে শিল্পকলা প্রগতিশীল ও রাজনীতি সচেতন ছিল ঠিকই, কিন্তু ভারতের আধা-বুর্জোয়া, আধা-সামন্ততান্ত্রিক ঔপনিবেশিক সমাজব্যবস্থায় গ্রাম-শহরের তফাৎ ঘুচিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল না। গ্রাম-শহরের মধ্যে ভাষা, রুচি, পরিবেশ, সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রভেদের ফলে শহুরে শিল্পকলায় লোকজীবনের সচেতন পূর্বাভাস থাকলেও, শেষ পর্যন্ত গণের শিল্প হয়ে উঠতে পারেনি। সুধী প্রধান চিনের বিপ্লবী নাট্যচর্চার অনুষঙ্গে গণনাট্য সংঘের সূচনালগ্নের এই ত্রুটির দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন।[৪] বিপ্লবকালে চিনের শিল্পীরা গ্রামীণ পরিবেশে দীর্ঘদিন তাদের লড়াইয়ের সঙ্গী হয়ে নাটকের উপাদান সংগ্রহ করতেন। ভারতে গণনাট্য সংঘের প্রাথমিক লগ্নে সেই প্রচেষ্টা সফল হয়নি। নীতিগত কারণ যেমন ছিল, তেমনই ছিল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক পরিস্থিতির পার্থক্য। রাজনৈতিক কারণেই চিনের সামাজিক কাঠামোতে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির প্রভাব ছিল না। অন্যদিকে প্রায় দুশো বছর ব্রিটিশ শাসকের পদানত থাকার ফলে ভারতের বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির ব্যাপক প্রভাব ছিল।

১৯৪৩-৪৪ সালে বাংলায় গণনাট্য সংঘ 'হোমিওপ্যাথি', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' প্রভৃতি নাটক প্রযোজনা করে। শুধু মঞ্চসাফল্যের দিক থেকে নয়, এই প্রযোজনাগুলি বাংলা থিয়েটারে প্রকৃত অর্থে গণচেতনার জন্ম দেয়। বিশেষ করে 'নবান্ন'। কাহিনি, সংলাপ, মঞ্চসজ্জা, যৌথ অভিনয়, তাত্ত্বিক

আদর্শ বাংলায় গণনাট্যের ভিতকে শক্ত করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পরবর্তীকালে 'নবান্ন'-এর বিভিন্ন ত্রুটি আবিষ্কার করা হলেও সমকালে 'নবান্ন' হয়ে উঠেছিল গণনাট্যের আদর্শ উদাহরণ। তবে সেই সময়েও অনেকে 'নবান্ন'-এর অভিনয় সম্পর্কে আপত্তি তুলেছিলেন। তাদের যুক্তি ছিল 'নবান্ন'-এ গণআন্দোলন সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি, শ্রেণিসংগ্রাম ও আশাবাদের অভাব রয়েছে। তখন পি সি যোশী 'নবান্ন' অভিনয়ের সবুজ সংকেত দেন। তাঁর মত ছিল,

> "গণনাট্যের আদর্শ যারা মেনে নিয়েছে তাঁদের স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে; প্রথম দিকে কাজ করতে গিয়ে তাঁদের ভুল ত্রুটি যদি হয়, তবে তা তারাই কাজ করতে করতে বুঝবে এবং সংশোধন করবে। ওপর থেকে কিছু চাপিয়ে দিলে তাঁদের কর্মপ্রেরণা নষ্ট করা হবে।"[৫]

তারপরেও 'নবান্ন'-এর কয়েকটি দৃশ্যের রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে পার্টির নেতৃবৃন্দের পক্ষ থেকে আপত্তি জানানো হলে শম্ভু মিত্ররা যথেষ্ট বিরক্ত হন।[৬] সুধী প্রধানের মত ছিল 'নবান্ন'-এর বিরাট চরিত্রলিপি, ঘূর্ণায়মান মঞ্চব্যবস্থা নিয়ে গ্রামে গ্রামে গণনাট্যের বিস্তার নিতান্তই দুরাশা মাত্র। তাতে পার্টি নেতাদের বক্তব্য ছিল 'নবান্ন' অভিনয়ের পর শিল্পীদের পার্টি-সাহিত্য পড়িয়ে মত বদলের চেষ্টা করা হবে।[৭] কিন্তু 'নবান্ন'-এর ঝোড়ো সাফল্যের সামনে অনেক যুক্তি খারিজ করে দেওয়া হয়। বস্তুত 'নবান্ন'সহ গণনাট্যের অন্যান্য প্রযোজনার সাফল্যের ফলে পার্টির 'জনযুদ্ধ' নীতির ব্যর্থতা তাৎক্ষণিকভাবে চাপা পড়ে যায়।

গণনাট্যের অনেক শিল্পী-সংগঠক, অনেক সমালোচক-তাত্ত্বিকরা এই সময়কালকে গণনাট্যের শ্রেষ্ঠ সময় বলে বিবেচনা করেন। সাফল্যমণ্ডিত শিল্প-প্রযোজনা, ভারতের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপ্তি, বহু গুণীজনের সমাগম, নাটক-নাচ-গান-সিনেমার মতো বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহারের ফলে গণনাট্য সংঘ এক বিরাট উৎসবের কর্ণধার হয়ে উঠেছিল। বামমনোভাবাপন্ন শিল্পীদের আদর্শপ্রাণ মনোভাব নিয়েও কোনো প্রশ্নচিহ্ন ছিল না। কিন্তু এত আয়োজনের মধ্যেও ভিতরে একটা চোরাস্রোত ছিল। গণনাট্য সংঘের সদ্যোজাত সংগঠনে বহু মতাদর্শের বুদ্ধিজীবীদের একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে জড়ো

করা হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে সেই উদ্দেশ্য ছিল ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তথাকথিত উদ্দেশ্যকে সরিয়ে পার্টির মুখটি প্রকট হয়ে উঠতেই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিতে থাকে। আন্তর্জাতিক মঞ্চের বিপদ কেটে গেলেও ভারতবর্ষ তখন পরাধীন। দূর দেশের ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার বদলে প্রত্যক্ষ ব্রিটিশ বিরোধিতার শিল্পনির্মাণের শক্তি গণনাট্য অর্জন করতে পারেনি। আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি সংগ্রাম, নৌবিদ্রোহ, রশিদ আলি দিবসের লড়াইয়ে সংঘকর্মীরা ব্যারিকেড তৈরি করার চেষ্টা করলেও যুদ্ধোত্তর যুগের অভ্যুত্থান কমিউনিস্ট পার্টি বুঝতে পারেনি।[৮] তার কিছুদিনের মধ্যেই শুরু হয় ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা।

এই উত্তাল পরিস্থিতিতে গণনাট্য সংঘ 'জবানবন্দী', 'শহীদের ডাক', গণসংগীত, নৃত্যনাট্য নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরলেও তা যথেষ্ট ছিল না। 'নবান্ন'-এর সৌরভও বিষাক্ত বাতাসে মিলিয়ে যায়। অথচ সেই সময়েই প্রথম পর্বের তেভাগার ডাক সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী জনতাকে একত্রিত হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। কিন্তু নিচু তলায় সংঘের বুনিয়াদ প্রথম থেকে তৈরি না হওয়ায় গ্রামাঞ্চলে সাংস্কৃতিক জনসমর্থন তৈরি হয়নি। নতুন শিল্পী উঠে আসার কোনো সাংগঠনিক পদ্ধতিও ছিল না। তার কিছুদিন আগেই বিজন ভট্টাচার্যের 'জিয়নকন্যা' গীতিনাট্যটিকে রূপকের অছিলায় বাতিল করে দেওয়া হয়। গীতিনাট্যটিতে বেদে জীবনের অনুষঙ্গে ভারতবর্ষের উপর সাম্প্রদায়িক বিষের প্রভাব ও সম্ভাব্য দেশভাগের ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল। এই গীতিনাট্যটি অভিনয় না করার ক্ষেত্রে 'নবান্ন'-এর মঞ্চব্যবস্থা বা লোকবলের যুক্তি খাটে না। অসংখ্য গুণী কণ্ঠশিল্পী ও নৃত্যশিল্পী তখন সংঘের প্রধানতম সম্পদ ছিল। তা সত্ত্বেও যে 'জিয়নকন্যা' অভিনয় হয়নি বা এই ধরণের নাটক আর রচিত হয়নি, তার কারণ ছিল সংঘের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। গণনাট্যের সংগঠকরা যতটা গুরুত্ব সহকারে বহির্বিশ্বের তাকিয়েছিলেন, দেশীয় পরিস্থিতির দিকে ততটা নজর দেননি। শহরকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক আন্দোলন হওয়ায় গ্রামীণ জনতাকেও চিনে উঠতে পারেননি। তাই যাত্রা, পালাগান, বোলান, আলকাপ, গম্ভীরার দেশের জনতার কাছে 'জিয়নকন্যা'কে রূপক বলে বাতিল করা হয়।[৯]

১৯৪৬ সালে বাংলার গণনাট্য সংঘে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্যসহ অনেকের সঙ্গেই সংঘের সংগঠক নেতৃত্বদের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ১৯৪৬ সালের ১৮ আগস্ট গণনাট্য

সংঘের তৎকালীন রাজ্য সম্পাদক চারুপ্রকাশ ঘোষ সংঘের অবস্থা নিয়ে আয়োজিত একটি সভার রিপোর্ট সিপিআই রাজ্য সম্পাদক ভবানী সেনকে পেশ করেন। যেখানে তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল,

> "বাংলা গণনাট্য সংঘ আজ যে গুরুতর বিপদের মধ্যে পড়েছে তার প্রধান কারণ হল পার্টিসেলের মধ্যে বিবদমান দুটি দলের সৃষ্টি।"[১০]

যার একদিকে ছিলেন 'ড্রামা স্কোয়াড'-এর শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য। যাঁদের বক্তব্য ছিল শিল্পকলার ব্যাপারে পার্টি নেতা বা শিল্পের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নন এরকম ব্যক্তির বক্তব্য তাঁরা গ্রহণ করবেন না। 'নবান্ন' প্রযোজনাকালে পার্টির কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি প্রযোজনায় কয়েকটি পরিবর্তনের প্রসঙ্গ তুললে তাঁরা উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। 'নবান্ন'-এর পর প্রায় দুবছর নতুন প্রযোজনাহীন ড্রামা স্কোয়াডের 'কার্যত মৃত'[১১] অবস্থা দেখে পার্টি জেলা কমিটির কয়েকজন গণনাট্য কর্মীকে প্রাদেশিক স্কোয়াডে নেওয়ার প্রস্তাব দেয়। ব্যালে স্কোয়াডের গঠন ও জেলা কমিটির কর্মীদের প্রবেশ দুটি ক্ষেত্রেই শম্ভু মিত্ররা তীব্র আপত্তি জানান। তাঁরা মনে করেছিলেন এটি উপরওয়ালার অযথা হস্তক্ষেপ এবং সংঘের সঙ্গে সম্পর্কহীন ব্যক্তিকে এই মুহূর্তে সংঘে গ্রহণ করা বিপজ্জনক।[১২]

এই সময়ে সংঘে তীব্র অর্থসংকট দেখা দেয়। তখনও পর্যন্ত গণনাট্যের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল পিপলস রিলিফ কমিটির হয়ে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য অর্থসংগ্রহ করা। অথচ দু-বছর নতুন কোনো নাটক মঞ্চস্থ না হওয়ায় সংঘ তখন প্রায় কপর্দকশূন্য। 'জিয়নকন্যা' মঞ্চস্থ করার অনুমতি পাওয়া যায়নি। শম্ভু মিত্র 'ধরতি কা লাল' সিনেমায় অভিনয় করার জন্য মুম্বই চলে যান। তাই দ্রুত ব্যালে স্কোয়াড তৈরি করে একটি অনুষ্ঠান করা হয়। যা নাটক বিভাগের অনেকেরই মনঃপূত হয়নি। ফলে সংঘের মধ্যে দুটি ভাগ হয়ে যায়—"ব্যালে কিছু কাজ করছিল—কিন্তু নাটকের দল কিছুই করছিল না।"[১৩] যার একদিকে ছিলেন শম্ভু মিত্র, অন্যদিকে সুধী প্রধান। শম্ভু মিত্রকে পুনরায় 'নবান্ন' প্রযোজনা করার প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি কম সময় ও শিল্পীদের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে নাটকের মান নষ্ট করতে চাননি। শেষ পর্যন্ত সেই সভা থেকে কোনো সুরাহা বেরিয়ে আসেনি। চারুপ্রকাশ

ঘোষের মূল্যায়ন, "নবান্ন-এর পর আমাদের আদর্শের প্রতি ক্ষতিকর দ্বন্দ্ব ছাড়া আমরা কিছু করিনি।"[১৪]

এই বিতর্কে শম্ভু মিত্র, বিজন ভট্টাচার্য, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রদের বক্তব্য ছিল শিল্পকলার ব্যাপারে পার্টি কোনো নির্দেশ দিতে পারে না। গণনাট্যের মঞ্চে তাঁদের প্রতিভা বিকাশের পরিকাঠামো ও আঙ্গিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। 'নবান্ন' প্রযোজনার ফলে গণনাট্যের যে উচ্চমান তৈরি হয়েছে, কোনোভাবেই তার সঙ্গে আপস করা যাবে না, প্রয়োজনে অভিনয়ের কাজ বন্ধ থাকবে।[১৫] অন্যদিকে সুধী প্রধানের নেতৃত্বাধীন পক্ষের বক্তব্য ছিল গণনাট্য বৃহত্তর জনগণের মধ্যে সম্প্রসারণের মাধ্যমেই সার্থক হতে পারে। আঙ্গিকের চর্চা বুর্জোয়া চিন্তাধারার ফসল ও দ্বিতীয় স্তরের কাজ। উচ্চ শিল্পগুণের আঙ্গিকপন্থীরা গণনাট্যের অবস্থান থেকে দূরে সরে গিয়ে পার্টি-নির্দেশ উপেক্ষা করছেন। তাই তাঁদের বিরোধিতা করা দরকার। এক্ষেত্রে সুধী প্রধানরা আঙ্গিকপন্থী "কমরেডদের গণনাট্য সংঘ ত্যাগ করার আশঙ্কাকে হিসাবের মধ্যেই আনছেন না"।[১৬]

স্পষ্টতই 'উপদলীয় কোঁদল'-এর জেরে গণনাট্য সংঘে ভাঙন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। গণনাট্যে পার্টির হস্তক্ষেপ নিয়ে বিতর্কের ছায়া এমনিতেই দীর্ঘ হয়ে উঠছিল, নতুন করে আনুগত্য প্রমাণের প্রশ্নে অনেকেরই ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। স্বাধীনতার পর 'পার্টি-লাইন'-এর প্রয়োগে বাংলার সংঘে ভাঙনের সলতে পাকানোর কাজ এই সময়েই শুরু হয়ে গিয়েছিল।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা-দেশভাগের পর গণনাট্যের পরিধি যেমন ছোটো হয়ে যায়, তেমনই স্বাধীনতার গুরুদায়িত্বও তার উপর বর্তায়। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অপসারণ ঘটেছে, কিন্তু অসংখ্য সমস্যায় মানুষ জর্জরিত। বেকারত্ব, মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, সামন্ততন্ত্র, শ্রমিক অসন্তোষের মতো সমস্যা পূর্ববৎ জারি রইল, নতুন সংযুক্তি ঘটল উদ্বাস্তু পরিস্থিতির। প্রাথমিকভাবে গণনাট্য সংঘ নেহরু পরিচালিত কংগ্রেসি সরকারকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত নেয়। পার্টির নির্দেশে স্বাধীনতার দিন কংগ্রেস সাহিত্য সংঘের সঙ্গে জাতীয় পতাকাও উত্তোলন করে। কিন্তু উদ্বাস্তু পরিস্থিতি নিয়ে রচিত দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাস্তুভিটা' নাটকটি প্রথমে কোনো এক অজ্ঞাত কারণে গণনাট্য সংঘ করতে রাজি

হয়নি। নাটকটি দীপায়ন ক্লাব দ্বারা প্রযোজনার পর গণনাট্য সংঘের রাজ্য সম্পাদক চারুপ্রকাশ ঘোষের ব্যক্তিগত উৎসাহে গণনাট্য সংঘ অভিনয় করে।[১৭]

১৯৪৮-এর জানুয়ারিতে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে পি সি যোশীর বদলে নতুন সভাপতি হন বি টি রণদিভে। 'ঝুটা স্বাধীনতা' নীতিতে সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ডাক দেওয়া হয়। মার্চ মাসে কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ করা হয়। পার্টির 'ঝুটা রাজনীতি'র প্রভাবে বাংলার বামমনোভাবান্ন বুদ্ধিজীবী মহলসহ গণনাট্য সংঘের নীতিতেও এক অলিখিত বদল দেখা যায়। সজল রায়চৌধুরীর মতে পি সি যোশীর নেতৃত্বে গণনাট্য সংঘ এতদিন শুধু আপসের পথ ধরে শ্রেণি-সমঝোতা করে এসেছে, যা বুর্জোয়া সংস্কৃতির নামান্তর। আজকের শিল্পকর্মকে পেশাদারী শিল্পীদের সৌন্দর্য ত্যাগ করে শ্রমিক-কৃষকদের বিপ্লবী আন্দোলনের সমরসঙ্গী হতে হবে।[১৮] সেই দৃষ্টিভঙ্গির আলোকেই 'নবান্ন', 'ভারতের মর্মবাণী', 'শহীদের ডাক' প্রভৃতি প্রযোজনায় শ্রেণিসংগ্রাম ও আশাবাদের অভাব, বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রাধান্য নিয়ে তুমুল সমালোচনা করা হয়। দাবি করা হয় যে এতদিন গণনাট্যে শ্রমজীবীরা যথার্থ মর্যাদা পায়নি। দপ্তরে বসে প্রকৃত পরিস্থিতি বিচার না করেই ঠিক করা হত কোথায় কোন নাটক অভিনয় করা হবে। ফলে গণনাট্য সংগ্রামী গণআন্দোলনের সঙ্গী হতে পারেনি।[১৯]

সুরপতি নন্দী মার্কসবাদী নেতাদের আদর্শ-বিচ্যুতি ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের কাছে আত্মসমর্পণকে দোষারোপ করে বলেন যে পেশাদার শিল্পীদের অতিরিক্ত 'তোয়াজ' করে একটা লেজুড় মনোবৃত্তি তৈরি করা হয়েছিল। উচিত ছিল তাঁদেরকে মার্কসীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা।[২০] হেমাঙ্গ বিশ্বাস মনে করতেন সংঘ এতদিন শহুরে সংস্কৃতিতে অধিক জোর দিয়েছিল, তাই কলাকৌশল-বিশেষজ্ঞ শিল্পীদেরই প্রাধান্য দেওয়া হত। ট্রেড-ইউনিয়ন তথা কিষাণ সভার নেতারা গণনাট্যের গান-নাটক-নাচকে মিটিং-এ লোক জমায়েত বা চাঁদা তোলার মাধ্যম ছাড়া কিছু ভাবতেন না। এমনকি মাও-এর ইয়েনান ফোরামের দলিলটি হাতে পেয়েও পার্টি নেতারা ব্যবহার করতে চাননি। তাই সূচনায় শ্রমিক-কৃষকের কথা তুলে ধরতে চাইলেও কিছুদিনের মধ্যেই পথভ্রষ্ট হয়। সাংগঠনিক দিক থেকে প্রথমে শ্রমিক নেতা এন এম যোশীকে সভাপতি ও কৃষক নেতা বঙ্কিম মুখার্জিকে সহ-সভাপতি

করে কাজ শুরু করলেও কয়েকদিন পরে সেই পদ দখল করেন নেহরুর বোন বিজয়লক্ষী পণ্ডিত ও খাজা আহমেদ আব্বাস।[২১]

গণনাট্য সংঘের সূচনালগ্নেই যে বেশ কিছু দুর্বলতা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহ্য ও নিজেদের অতীত শিল্পকর্মের ভূমিকা নস্যাৎ করে দেওয়া মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্বের ধারণা নয়। এই প্রবণতা দেখা যায় ১৯৪৬ সালে রাশিয়ার লেনিনগ্রাদে ঝানভের (Andrei Zhdanov) বক্তৃতার মধ্যে দিয়ে। ঝানভ প্রাচীন বুর্জোয়া সংস্কৃতিকে গলিত, বিকৃত আখ্যা দিয়ে সোভিয়েত লেখকদের এই সাহিত্যকর্মগুলিকে প্রত্যাঘাত ও আক্রমণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তিনি ফতোয়া দিয়েছিলেন নান্দনিক দিক নয়, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণই হওয়া উচিত সাহিত্যের একমাত্র কাজ। একই সময়ে আরাগঁ-র (Louis Aragon) পার্টি-লাইনকেন্দ্রিক সাহিত্য ও গারোদি-র (Roger Garaudy) স্বাধীন উদারপন্থী সাহিত্যের বিতর্ক চরমে ওঠে। ঝানভের বক্তৃতার পর আরাগঁ-র লাইন প্রতিষ্ঠিত হয়। গণনাট্য সংঘেও এই সময়ে 'শৈল্পিক স্বাধীনতা'-র প্রশ্নে ভাঙন দেখা দেয়। ঝানভের বক্তৃতা ও আরাগঁ-র সাফল্যের ভিত্তিতে তাঁদের প্রত্যুত্তর দেওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। অন্যদিকে মাও-এর বক্তব্যের সম্পূর্ণ উলটো পথে হেঁটে চৌ-এন-লাই উচ্চাঙ্গের শিল্পনির্মাণের বদলে জনপ্রিয় শিল্পনির্মাণের কথা বলেন। তাঁর আদর্শে বাংলায় চিন্মোহন সেহানবীশ পরামর্শ দেন শিল্পনির্মাণের থেকেও এই মুহূর্তে পথে নেমে শ্রেণিসংগ্রাম করা অধিক প্রয়োজন। প্রয়োজনে সাহিত্যকর্ম বন্ধ থাকবে।[২২]

বিদেশি শিল্প-আন্দোলনের সমালোচনা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে যে চিন-রাশিয়া-ফ্রান্সের শিল্প-আন্দোলন ও সেই সংক্রান্ত বিতর্ক বাংলার প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করা আদৌ বাস্তবযোগ্য ছিল কিনা? বিপ্লবী চিনের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনুযায়ী 'মুক্তাঞ্চল'গুলিতে তাঁরা নিজস্ব শিল্পনির্মাণের পথ খুঁজে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ঠাণ্ডা যুদ্ধের সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সদাসন্ত্রস্ত চোখ তাদের শিল্প-সাহিত্যকে প্রতি মুহূর্তে জরিপ করেছিল। যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সের চূড়ান্ত অবক্ষয়ের মধ্যে তাঁরা জীবনকে চেনার নতুন বিতর্কে মেতে উঠছিলেন। কিন্তু বাংলা তথা ভারতের অবস্থা অন্য দেশগুলির তুলনায় স্বতন্ত্র ছিল। বাংলার বামপন্থী শিবিরের বুদ্ধিজীবীরা স্বাধীন দেশের সমস্যাকীর্ণ

মানুষের মুক্তির জন্য স্বতন্ত্র কোনো মতবাদ বিবেচনা করার কথা ভেবে দেখলেন না। বরং ঝানভ-আরাগঁ-লু স্যুনের তর্ক শিল্প-সাহিত্যের উপর চেপে বসে। যে সকল বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা দেশ-কালের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পনির্মাণের কথা ভেবে পার্টি-লাইনের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরাও ছিলেন নিতান্তই সংখ্যালঘু। এবং প্রতিবাদ করলেই 'সংশোধনবাদ'-কে ঢাল করে তাঁদের আক্রমণ করা হত। যেভাবে তৎকালীন পার্টি-নীতির সমালোচনা করলেই 'সংশোধনবাদী' বলে দাগিয়ে দেওয়া হত।[২৩]

গণনাট্য সংঘে তখন ভাঙনের সময়। সাংস্কৃতিক ও সাংগঠনিক মতপার্থক্য ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি তো ছিলই, তার সঙ্গে শারীরিক আক্রমণের ভয়ও ছিল। একটি নবগঠিত সাংস্কৃতিক আন্দোলন, যা সদ্য নিজের পায়ে দাঁড়ানোর সক্ষমতা অর্জন করেছে, অথচ ক্রমাগত মতপার্থক্যের জন্য ইতিমধ্যেই ভাঙনের চোরাস্রোত ঢুকে গেছে। এরকম একটি পরিস্থিতিতে বিপ্লবের সম্ভাবনায় পার্টি-নীতির দৃঢ় বাঁধন চাপিয়ে দেওয়ার ফল যা হতে পারে, তাই হল। বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যসহ অনেকে দল ছেড়ে দেন। জাতীয় সংগঠন থেকেও অনেকে সরে যান। কেন্দ্রীয় স্কোয়াড ভেঙে যায়। তাঁদের মধ্যে অনেকে গণনাট্য প্রদর্শিত নাট্য-আন্দোলনের শরিক থেকে যান, আবার অনেকে সংঘের পথ ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নিজস্ব ঘরানার শিল্পচর্চা শুরু করেন। ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্ত, পানু পালরা তখন সদ্য সংঘে এসেছেন। সংঘের অভ্যন্তরে পার্টি-লাইনের প্রতিবাদকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকায় 'নবনাট্য আন্দোলনের সংকট' প্রবন্ধে তিনি সজল রায়চৌধুরী ও সুরপতি নন্দীর লেখার বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল নতুন নীতিতে সংঘ গণতান্ত্রিক সংগঠনের বদলে দলীয় সংস্থায় পরিণত হয়েছে।[২৪] সম্ভবত সেই কারণেই তাঁর লেখা 'তরঙ্গ', 'মশাল' প্রভৃতি নাটক প্রথমে অভিনয়ের অনুমতি পাওয়া যায়নি। সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ঋত্বিক ঘটক পরবর্তীকালে মন্তব্য করেছিলেন,

> "গণনাট্য সংঘ অতীতে শহরের উপর বেশি জোর দিয়াছিল এবং সংগ্রামী ভাবাদর্শ ও দেশের বেশির ভাগ জনতার আদর্শ হইতে সরিয়া গিয়াছিল। মজুর এবং কৃষক, যাহারা দেশের অধিকাংশ, তাহাদের মধ্যে জনপ্রিয়তার প্রশ্নে জোর দেয় নাই।... তাহার পরে সে মত বদলাইল। কাল্পনিক একটা বৈপ্লবিক অবস্থা মনে করিয়া সে সোজা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইল। মজুর কৃষকের নামে সে মধ্যবিত্ত সুলভ অতি বিপ্লববাদ বাস্তবতার উপর চাপাইয়া দিল।"[২৫]

১৯৪৯ সালে এলাহাবাদে গণনাট্য সংঘের ষষ্ঠ সর্বভারতীয় সম্মেলনে এই সংকীর্ণতার উপরে শিলমোহর দেওয়া হয়। কমিউনিস্ট পার্টির নীতি অনুযায়ী অর্থনৈতিক আন্দোলনকে মুক্তাঞ্চল তৈরি বা রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের মতো রাজনৈতিক শ্রেণিসংগ্রামে পর্যবসিত করার পরিকল্পনার ফলে সংঘ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। পার্টি-নীতির মতো করে সমাজতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে গিয়ে সমস্ত গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। অঘোষিত নীতি নেওয়া হয় যে, যত বড়ো নাট্যকারই হোক না কেন, কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনি ইস্তেহার ট্রামে বাসে বিলোবার সাহস না দেখাতে পারলে তাঁকে গণনাট্যের একজন বলে গণ্য করা হবে না।[২৬] নিষিদ্ধ অবস্থায় গণসংগঠন বিস্তারের কাজও যথার্থভাবে করা সম্ভব হয়নি। তার সঙ্গে ছিল রাষ্ট্রীয় অত্যাচার। এই সকল সমস্যার মধ্যে থেকে কীভাবে গণসংস্কৃতি সম্প্রসারিত করতে হবে, তার নির্দেশ দেওয়া হয়নি। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতে "এলাহাবাদ সম্মেলনের প্রধান দুর্বলতা ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সামন্তবাদ-বিরোধী সাংস্কৃতিক গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গড়ার কোনো কর্মসূচি সেখানে রাখা হয়নি।"[২৭] শুধু বলা হয়েছিল শিল্পকলায় দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের কথা ভুলে মাঠে-ময়দানে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামলেই সংঘ তার যোগ্য গৌরব অর্জন করতে পারবে।

কার্যক্ষেত্রে সংঘের দুটি শাখা ব্যতীত অন্যান্য শাখা মৃতপ্রায় হয়ে রইল। পার্টি সার্কুলারের ফলে আইপিটিএ-র কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যায়।[২৮] সেই সময়ে সংঘের প্রত্যক্ষ ছাপ না থাকলে অর্থাৎ সংগঠনের নেতাদের পছন্দ না হলে কোনো নাটক গণনাট্য পদবাচ্য হত না। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত, "কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক কর্মসূচি ও মতাদর্শসম্মত না হলে কোনো নাটকই গণনাট্যের পর্যায়ে আসতে পারে না, এ বোধ ছিল সংঘের বেশ একটি প্রভাবশালী অংশের।"[২৯] কোনো নাটক অভিনয়ের আগে তা গণনাট্যের যোগ্য কিনা বিচার করার জন্য পার্টির প্রাদেশিক কমিটির তরফ থেকে একটি অ্যাজিট-প্রপ কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী কিছু নাটক জমা পড়েছিল, যেগুলি পড়ে পড়ে নষ্ট হয়। কারণ "হাতে গোনা ক'জন পার্টি নেতা ছাড়া আর

কারোরই সেগুলো 'বিচার' করার ক্ষমতা ছিল না।"[৩০] পরে কমিউনিস্ট পার্টির বুলেটিনে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে শ্রমিক-কৃষকের 'জঙ্গী' আন্দোলন আর সংস্কৃতি সৃষ্টি করতে গিয়ে গণনাট্য সংঘের মতো একটি শক্তিশালী মাধ্যমকে নষ্ট করা হয়েছে।[৩১] আর শিল্প সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ রাজনৈতিক শিবিরের অদৃশ্য হাত দ্বারা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের উপর প্রভাব বিস্তার করা শুধু অবিবেচকের কাজ নয়, আপত্তিকরও বটে। যে কারণে ঋত্বিক ঘটক বলেছিলেন,

> "কাল্পনিক বিপ্লবের আপাতবাস্তবের উপর জোর দিয়া সে শিল্প সুলভ আঙ্গিককে অবজ্ঞা করিল, ফলে শিল্প আর শিল্প রহিল না, জিগিরে পরিণত হইল।"[৩২]

এই সময় থেকেই সংঘে পার্টি অনুপ্রবেশের সরাসরি সুযোগ করে দেওয়া হয়। স্বাধীনতার পূর্বে গণনাট্যে পার্টির উপস্থিতি সত্ত্বেও একটি তথাকথিত দূরত্ব ছিল। যে শূন্যস্থানে পার্টি-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীরা অবস্থান করতে পারত। কিন্তু বর্তমানে সংঘের পুনর্গঠনের জন্য পার্টি-সংগঠনকে ব্যবহার করার ফলে পার্টিনীতির উপর নির্ভরতা আরও বেড়ে যায়।

চারের দশকের শেষ থেকেই পার্টির সঙ্গে সঙ্গে গণনাট্য সংঘেও আত্মসমালোচনা শুরু হয়। ১৯৫০ সালে শ্যামবাজারের বঙ্গীয় কলালয়ে আটদিন ব্যাপী একটি মিটিং-এ সজল রায়চৌধুরীদের নীতিকে দোষারোপ করা হয়। মূল অভিযোগকারী ছিলেন সংঘের সর্বভারতীয় সম্পাদক নিরঞ্জন সেন ও নির্মল ঘোষ।[৩৩] পার্টি তথা সংঘ-নীতির আমূল পরিবর্তন ও সংঘের মধ্যে ক্রমাগত ব্যক্তি সমালোচনার ফলে এক বিভ্রান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়।[৩৪] পার্টির 'ঝুটা রাজনীতি'র সময়ে গণনাট্যের পরিস্থিতি নিয়ে সুধী প্রধানের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ছিল যে, সংস্কারবাদ অতি-বামবিচ্যুতির পথ করে দেয়। অর্থাৎ স্বাধীনতার পূর্বে রাজনৈতিক আদর্শ ব্যতিরেকে মহৎ শিল্পনির্মাণের শ্রেণিসমঝোতার নীতির ফলেই গণনাট্যে অবক্ষয় এসেছিল। আবার ১৯৫২ সালের বোম্বাই সম্মেলনের নীতিকে তিনি বলছেন 'দক্ষিণপন্থী সংস্কারবাদ'। কারণ এই সম্মেলনেই পার্টির নতুন সম্পাদক অজয় ঘোষ বলেন যে "প্রগতি কথাটা অস্পষ্ট—কাজেই যা কিছু প্রতিক্রিয়াশীল নয়—তাই গণনাট্য করবে।"[৩৫] এমনকি বিনোবা ভাবের ভূমিদান নিয়ে নাটক করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। আসলে তার কিছুদিন আগেই

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সম্মেলনে রণদিভের 'ঝুটা স্বাধীনতা' নীতিকে বাতিল করা হয়েছিল। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনকে সামনে রেখে সাংবিধানিক ক্ষমতা দখলের হাতছানিও পার্টির সামনে ছিল। পার্টির অতিসাবধানী নীতি সর্বভারতীয় গণনাট্যকে আচ্ছায়িত করেছিল।

তেভাগা-তেলেঙ্গানার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ থেকে সরে আসার পর শিল্পকে কীভাবে গণসংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে, সে বিষয়ে সংঘ সংগঠক, পার্টি নেতৃত্ব অদ্ভুত নীরবতা নিয়েছিলেন। পাঁচের দশকের মাঝামাঝি সময়ে যখন আপাতদৃষ্টিতে সংঘের সাংগঠনিক বিস্তার ঘটেছে, নিত্য নতুন আদর্শপ্রাণ শিল্পীর আগমন ঘটছে, প্রযোজনার সংখ্যা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, বাংলার প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আন্দোলন নিয়ে নাটক প্রযোজনা করা হচ্ছে, সরকারি বিধিনিষেধও অনেকটাই শিথিল হয়ে এসেছে; তখনও নাটকের মান, গণসংস্কৃতি আন্দোলনের পদ্ধতি, গণনাট্য সংঘের ভবিষ্যতের মতো কয়েকটি অস্বস্তিকর বিষয় নিয়ে ঋত্বিক ঘটক প্রশ্ন তুলেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল গত চার বছরের স্থিতাবস্থার মধ্যে কোনো উঁচুদরের শিল্পকর্ম রচনা করা যায়নি। শিল্প হয়ে গেছে শৌখিন অপেশাদারি মঞ্চের 'বক্তা-প্রধান' তৃতীয় শ্রেণির কাজ। অথচ এ ব্যাপারে সংঘ কর্তৃপক্ষ বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করেনি। পার্টির তরফ থেকেও 'কাঁধ-ঝাকানো' ভঙ্গিতে প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য স্বাচ্ছন্দ্যহীন প্রশ্ন পার্টি এড়িয়ে যায়।[৩৬]

একই সময়ে ১৯৫৪ সালে পার্টি নেতা নাম্বুদ্রিপাদ প্রশ্ন তুলেছিলেন যে আইপিটিএ-র আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কিনা? যদি থাকে তাহলে সর্বভারতীয় কাঠামোর কী দরকার?[৩৭] এরকম অনভিপ্রেত প্রশ্ন কেন উঠেছিল তার উত্তর পাওয়া যায়নি। কিন্তু গণনাট্য সংঘের পঞ্চাশ বছরে সংকলনের সম্পাদক এই প্রশ্নের মধ্যে ছয়ের দশকে মতাদর্শগত কারণে গণনাট্য সংঘের ভাঙনের বীজ দেখেছেন।[৩৮] ১৯৫৬-র পালঘাট সম্মেলনের সময় কমিউনিস্ট পার্টির সর্বভারতীয় পরিষদের একটি অংশ নেহরুকে প্রগতিশীলতার প্রতীকরূপে দেখতে থাকে। পার্টির মধ্যে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' (NDF) ও গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট (DF) নিয়ে বিতর্কের সময় ভাগাভাগি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।[৩৯] যার প্রভাব গণনাট্য সংঘকেও প্রায় নিষ্ক্রিয় করে দেয়। এমনিতেও গণনাট্যের সপ্তম সম্মেলনে শ্রমিক-কৃষকের সংগ্রামে অংশগ্রহণের ব্যাপারে আগ্রহ দেখানো হয়নি। ১৯৫৭-৫৮-র অষ্টম সম্মেলনে সংঘকে নাট্য-

আকাদেমির সঙ্গে যুক্ত করা হয়, অথচ কিছুদিন আগে পর্যন্ত নাট্য আকাদেমিকে কংগ্রেসের আগ্রাসী সাংস্কৃতিক নীতির অংশ বলে মনে করা হয়েছিল। সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য সরকারের উপর আস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।[৪০] ১৯৫৮-তে গণনাট্য সংঘের সম্মেলনে দেশের রাষ্ট্রপতি ও কংগ্রেসী মন্ত্রীদেরও আগমন শুরু হয়। যেখানে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বামপন্থীরা শহরে-গ্রামে লড়াই করছে, গণনাট্যের শিল্প নির্মিত হচ্ছে কংগ্রেসি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে, সেখানে গণনাট্যের মঞ্চে কংগ্রেসীদের আগমন অনেক শিল্পীই ভালো চোখে দেখেননি।[৪১] 'দক্ষিণপন্থী সংশোধনবাদ'-এর ধারণা আবার তাড়া করতে থাকে। গণনাট্যের মধ্যে মতাদর্শের দ্বন্দ্ব এত তীব্র হয়ে ওঠে যে বাইরের জাঁকজমক সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির বুলেটিনে স্বীকার করে নিতে হয়,

> "সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের অবস্থা অত্যন্ত বিশৃঙ্খল। পার্টি হইতে কোনো লক্ষ্য না দেওয়ার ফলে শুধু যে ইহা দুর্বল হইতেছে তাহাই নহে, নানা গুরুতর ত্রুটিও প্রবেশ করিয়াছে। গণনাট্য সংঘ একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে পরিণত হইয়াছে। এই সংঘ ও পার্টির সহিত সংশ্লিষ্ট অনুরূপ অন্যান্য সংগঠনগুলির মধ্যে কোনো যোগাযোগ বা সহযোগিতা পর্যন্ত নাই।"[৪২]

বস্তুত ১৯৫৫-র পর থেকেই গণনাট্যের জনপ্রিয়তা কমে আসতে থাকে। বাৎসরিক একটি সম্মেলন বা একটি জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান করে রক্তাল্পতা সাময়িক আটকানো যাচ্ছিল। ১৯৬০-৬১-র গণনাট্য উৎসব নিয়ে অত্যন্ত গর্ব করে সজল রায়চৌধুরী সংঘে ভাঙনের গুজব উড়িয়ে দিয়েছিলেন।[৪৩] উৎসব দুটি যে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু বাতাসে গুজব ছিল বলেই সজল রায়চৌধুরীকে জোর করে ভাঙনের প্রসঙ্গ আনতে হয়। তার দু-বছরের মধ্যেই বাহ্যিক উৎপীড়ন ও অন্তর্দ্বন্দ্বে জীর্ণ কমিউনিস্ট পার্টি দু-ভাগে বিভক্ত হয়ে গেল। অনেকেই পার্টির তৎকালীন নীতিকে সমর্থন করতে পারল না, অনেকে অত্যাচারের মুখে সরে গেলেন, অনেকে দলবদল করলেন। পারস্পরিক দোষারোপ আর মতাদর্শের সংঘাতের থেকেও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল সংঘের সংগঠন হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

১৯৪৮-৫০-এর মধ্যেও গণনাট্য সংঘে অচলাবস্থা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু তখন রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের সহজ পদ্ধতির শিথিলতা শিল্পীদের গ্রাস করেনি। তখনও গণনাট্য পার্টি-নীতির দিকে তাকিয়ে থাকত, কিন্তু ক্ষুদ্র সাংগঠনিক শক্তিতে নিজস্ব পথনির্মাণের স্বাধীনতা ছিল। পরে ঋত্বিক ঘটকের অভিজ্ঞতা হয়েছিল যে পার্টি সাংস্কৃতিক ফ্রন্টকে 'টাকা আয়ের যন্ত্র' আর 'মিটিং ও সম্মেলনে জনতা (জনগণ নয়) জোগানের ঠিকাদার'-এর বাইরে কিছু ভাবতে পারে না। কোনো কাজের আগে দেখতে হত এতে পার্টির কী উপকার হচ্ছে। সংস্কৃতির উপকার ধর্তব্যের মধ্যেই ছিল না। পার্টি-লাইনের উপর তিনিও অতিরিক্ত নির্ভর করেছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর বক্তব্য ছিল সংস্কৃতির মূল সমস্যা 'পার্টি-স্তরে'।[৪৪] সুধী প্রধানের মতো গণনাট্য সংগঠকও মনে করেন সংঘের গঠনতন্ত্রের স্বাধীনতা নির্ভর করত পার্টির দৃষ্টিভঙ্গির উপর। পার্টির নিজস্ব বিবেচনায় যে প্যানেল তৈরি হত, সংঘ তাকে মেনে নিত।[৪৫] ফলে পরবর্তীকালে পার্টির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা, পার্টির রাজনৈতিক পদক্ষেপের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সংঘের নীতি নির্ধারণ গণনাট্যের সংগঠনকে রক্ষা করতে পারেনি। হেমাঙ্গ বিশ্বাস সংঘের ভাঙনকে অত্যন্ত সহজ করে ব্যাখ্যা করেছেন,

> "ভেঙে গেল তো কমিউনিস্ট পার্টিই ভেঙে গেল, আর IPTA ভাঙবে না কেন? তোমার গণসংগঠনগুলি যদি সব ভেঙে যায় তাহলে IPTA-টা কি আকাশ থেকে আসলো নাকি? তোমার যদি চারটা-পাঁচটা দল হয়ে যায় যদি পার্টির, তাহলে IPTA-তে দলাদলি হবে না এমন ভাববার কোনো কারণ নেই।"[৪৬]

অনেক শিল্পী-সমালোচক-তাত্ত্বিক গণনাট্য সংঘের সার্বিক অবনমনের জন্য শিল্পীদের পেটি-বুর্জোয়া মানসিকতা ও রাজনৈতিক চেতনার অভাবকে দায়ী করেছেন। ছয়ের দশকে গণনাট্য সংঘ পুনর্গঠনের অন্যতম কাণ্ডারি শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে গণনাট্য সংঘের নাট্য-আন্দোলনে মধ্যবিত্ত শ্রেণি প্রবেশের ফলে মধ্যবিত্ত জীবনের দারিদ্র্য-হতাশা-বেদনা প্রবেশ করেছিল। শ্রমিক-কৃষকের চেয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে বেশি প্রাধান্য দিতে গিয়ে বৃহত্তর জনজীবন থেকে গণনাট্য বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই সুযোগে শাসক শ্রেণি সংঘের মধ্যে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, শিল্পীর স্বাধীনতা, শুদ্ধ শিল্পের মতো শোধনবাদী ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটায়।[৪৭] মনোরঞ্জন বিশ্বাসের বক্তব্য ছিল গণনাট্যের সর্বহারা শ্রেণির

আদর্শের মধ্যে বুর্জোয়া সাহিত্য-আদর্শ ঢুকে শ্রেণিসমন্বয়ের দিকে টেনে নিয়ে যায়।[৪৮] পেটি-বুর্জোয়া সমাজ একদিকে যেমন প্রগতিশীল, অন্যদিকে সামান্য আঘাতেই ভঙ্গপ্রবণ। গণনাট্য সমাজ বদলানোর বিরাট আয়োজন করতে পারেনি, সংগঠনের মূল ভিত্তিও ছিল দুর্বল বিপ্লবী চেতনার দ্বারা নির্মিত। এই আধা-সামন্ত, আধা-বুর্জোয়া মানসিকতার জন্য গণনাট্য ক্রমশ শহরমুখী হয়ে গেছে।[৪৯] কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন ওঠে গণনাট্যের কর্মীদের 'পেটি-বুর্জোয়া' মানসিকতা থেকে মুক্ত করার জন্য সংগঠন কেন দায়িত্ব নেয়নি? গণনাট্য সংঘের সংগঠনের দায়িত্বেও মূলত পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণিই ছিল। গুরুদাস পাল, দশরথলালদের মতো লোকশিল্পীদের কেন সংগঠনের মূল পদে টেনে আনা হয়নি? টগর অধিকারীর মতো শিল্পী কেন হারিয়ে গেলেন? গণনাট্য 'শহরমুখী' হয়ে যাচ্ছে জেনেও লোকআঙ্গিককে যথার্থভাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে অনীহা দেখা দিয়েছিল। সম্মেলনগুলিতে যতটা জোরের সঙ্গে লোকশিল্পকে ব্যবহারের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কার্যক্ষেত্রে ততটা সক্রিয়তা থাকলে 'শহরমুখী' সংস্কৃতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত। পবিত্র সরকার প্রশ্ন তুলেছিলেন গণনাট্য নিয়ে গ্রামে কজন গেছেন?[৫০] 'নবান্ন', 'জবানবন্দী'-র সময়ে গ্রামে গণনাট্য নিয়ে যাওয়ার সংখ্যা নিতান্তই কম ছিল। যদিও পাঁচের দশকে 'ডি-সেন্ট্রালাইজড' করার পর গ্রামাঞ্চলগুলিতে শাখাবিস্তার করা শুরু হয়েছিল। তবে সেই শাখাগুলি কতটা সক্রিয় ছিল সে বিষয়ে প্রশ্নচিহ্ন থেকেই যায়।

তাছাড়া পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণির শিল্পীদের দ্বারা জনগণের শিল্পনির্মাণ সম্ভব নয়, এ-কথার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ম্যাক্সিম গোর্কি দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসেছিলেন। আবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ জমিদার বংশের সন্তান। চেকভ, ব্রেশট, লু স্যুনরাও তথাকথিত প্রলেতারিয়েত ছিলেন না। বাংলায় বিজন ভট্টাচার্য, উৎপল দত্ত, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের মতো শিল্পীরা, যারা দলগত বা ব্যক্তিগতভাবে গণনাট্য নিয়ে মানুষের মাঝে পৌঁছোতে পেরেছিলেন তাঁদের বংশপরিচয়েও সর্বহারা ছাপ ছিল না। তাই প্রশ্নটা শ্রেণিচরিত্রের নয়, প্রশ্নটা শিল্পীর রাজনৈতিক সচেতনতা, মানবদরদী হৃদয়ের উদারতা আর শৈল্পিক নৈপুণ্যের। প্রাথমিকভাবে গণনাট্য সংঘ শিল্পীদের একটা মঞ্চ করে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পার্টি নির্দেশিত কাঠামোর মধ্যে থেকে তার প্রয়োগে একপাক্ষিকতা চলে এসেছিল। আর যেখানে পার্টির পথ ধরে সংঘও আপসের পথে হেঁটেছে, নির্বাচনকে সামনে

রেখে আদর্শকে নমনীয় করে নিয়েছে, সেখানে শিল্পীদের মধ্যে 'পেটি-বুর্জোয়া' প্রবণতা সঞ্চারিত হওয়া খুব স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। গণনাট্য সংঘ পার্টিগতভাবে ও সাংগঠনিকভাবে এই দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

রাজনৈতিক মতাদর্শ বনাম শিল্পচেতনা—নাট্যকাহিনি ও প্রযোজনাগত :

শিল্পকে উপযোগিতাবাদের দৃষ্টিতে দেখার ধারণা বহু প্রাচীন। ঠিক ততটাই প্রাচীন কলাকৈবল্যবাদের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বের ইতিহাস। শিল্পীর কাজ কী? শুধুই মতাদর্শ ও সমাজের প্রতি কর্তব্য, নাকি স্বাধীন পথে শিল্পনির্মাণ? প্লেটো তাঁর আদর্শ রাষ্ট্র থেকে কবিকে নির্বাসন দিয়েছিলেন। তিনি শিল্পীর স্বতন্ত্র বিশ্বের কল্পনার সঙ্গে জুড়ে দিতে চেয়েছিলেন রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ববান নাগরিকের কর্তব্য। অ্যারিস্টটল মহাকাব্যের উপরে ট্রাজেডিকে স্থান দিয়েছিলেন, কারণ তা 'ক্যাথার্সিস' ঘটিয়ে মানুষকে শুদ্ধ করে তোলে। মার্কস ও এঙ্গেলস অর্থনীতিকে সমাজের Base বা ভিত্তি ধরে সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সুপার স্ট্রাকচার (Super Structure) বলে অভিহিত করেছিলেন। সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের নায়ক লেনিন বা মাও-জে-দং দুজনেই শিল্প-সংস্কৃতির উপযোগিতাবাদের দিকটি উপেক্ষা করেননি। তাঁদের মতে প্রত্যেকটি সমাজব্যবস্থাই পরোক্ষভাবে শিল্পের 'উপযোগিতা'কে গুরুত্ব দেয়। বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থা শিল্পীর স্বাধীনতা হরণ করে আপন স্বার্থে ব্যবহার করতে চায়। 'শিল্পীর স্বাধীনতা' সেখানে একটি অলীক কল্পনামাত্র। তুলনায় সমাজতন্ত্র শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পূর্ণ-স্বাধীনতা দেয়। তাই সমাজতন্ত্রে শিল্পের উপযোগিতাবাদকে দেখা হয় অনেক বেশি প্রত্যক্ষভাবে। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিনের নন্দনতত্ত্ব, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ, মাও-এর শিল্পচিন্তা এই অর্থনৈতিক ভিত্তিকে ব্যক্ত করেছে। যে তত্ত্বগুলি তাঁদের সমাজের সাপেক্ষে শিল্পীর দায়িত্বকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল।

কিন্তু সমকালকে সেবা করার অর্থ শুধু রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে ফুটিয়ে তোলা নয়। যে কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ভিত্তিই শেষ পর্যন্ত মানুষের কথা বলতে চায়। শিল্পের প্রকৃত কাজ সেই মানুষের সেবা করা। মানুষের সঙ্গে মানুষ ও তার সমাজের সম্পর্কই সাহিত্যের

বৃহত্তর অংশ। মানুষের হৃদয়বৃত্তির চাহিদা পূরণ, তাঁর নান্দনিক পরিতৃপ্তি এবং 'মানুষ' রূপে তাঁকে পরিপূর্ণতা দান করা শিল্পের প্রধান কর্তব্য। রাজনীতি বা অর্থনীতি তার একটা অংশবিশেষ মাত্র। এঙ্গেলস লেখকের রাজনৈতিক বা যে কোনো মতামতের পরোয়া করেননি। শিল্পীর অন্তঃকরণের চেতনা সাহিত্যে কতটা বিষয়মুখী হয়ে উঠেছে, সেটাকেই তিনি শিল্পচেতনার মাপকাঠি ধরেছিলেন।[৫১] অ্যারিস্টটলের নির্দেশিত 'ট্রাজেডি'তে দৈবনির্দেশ উপেক্ষা করে মানুষ জয়যুক্ত হয়। শেকসপিয়রের নাটক থেকে তৎকালীন ঘাত-প্রতিঘাতকে সরিয়ে নিলেও তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির ট্রাজেডির বিস্তার অমরত্ব দাবি করে। মুকুন্দ চক্রবর্তীর কাব্যে তাঁর আত্মকাহিনির হাহাকার গীতিকবিতার মূর্ছনা নিয়ে আসে কিংবা ভাঁড়ু দত্ত, মুরারী শীলদের শঠতা তাদেরকে জীবন্ত করে তোলে। পদাবলী সাহিত্যের বহু রাগরাগিণীর প্রেম স্বর্গীয় মহিমা ফেলে মাটির কাছে নেমে আসে। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'-তে শ্রমিকদের রাজার জাল ভাঙার শব্দের সঙ্গে রাজা-নন্দিনী-বিশুর সম্পর্কের টানাপোড়েন, রঞ্জনের আগমনবার্তা, রাজার ক্ষমতাদর্পী অসহায়তার অদ্ভুত শিল্পিত ভাষার সৌন্দর্য আমাদের মুগ্ধ করে রাখে। 'মুক্তধারা'য় রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অশনিসংকেতের মধ্যে অভিজিতের আত্মবিসর্জন ব্যক্তির মাহাত্ম্যকে চিরন্তন করে তোলে। অর্থাৎ শিল্পীর প্রতিভায় তাঁর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের উপযোগিতা এবং শৈল্পিক সৌন্দর্য উভয়ের সার্থক মিলন সম্ভব।

শিল্পের ভূমিকা বা শৈল্পিক সৌন্দর্য অতি বিস্তৃত একটি ধারণা। শিল্পীর চেতনায় তা বহুরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠতে পারে। আবার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় তার মধ্যে তুলনামূলক বদল আসতে পারে। বিশ শতকের চারের দশকের উত্তাল সময়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা শিল্পকে সরাসরি রাজনৈতিক অস্ত্র রূপে শক্তিশালী করে তোলে। যেভাবে রাশিয়ায় বা চিনের বিশেষ পরিস্থিতিতে শিল্প-সংস্কৃতিকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও তাকে রক্ষা করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। সজল রায়চৌধুরীর মতে,

> "গণনাট্য সংঘ কারো কাছে মাথার চুল মানত রেখে প্রতিজ্ঞা করেনি যে রাজনীতি থেকে শতহস্ত দূরে থাকবে। শিল্পীর চৈতন্যলোকে (সে যে কোনো যুগেরই হোক না কেন) সমকালীন জীবন অস্বীকার করতে পারে না, সুতরাং আধুনিক শিল্পী তথাকথিত বিশুদ্ধ

শিল্পসৃষ্টির নামে আজকের নরলোককে অস্বীকার করবে কেন? উদ্দেশ্যবিহীন, রাজনৈতিক দৃষ্টিহীন শিল্পসৃষ্টি আজ পর্যন্ত কোনও দিন হয়নি—হবেও না।"[৫২]

বাস্তবিক গণনাট্য সংঘ কখনোই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ব্যতীত 'বিশুদ্ধ' শিল্পসৃষ্টির ধারণাকে প্রধানতম বলে দাবি করেনি। এবং সেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নির্দিষ্টভাবেই শ্রেণিসংগ্রামের পথ অবলম্বন করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এই পথেই গণনাট্যের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ঘটেছে। কিন্তু মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন-মাও প্রত্যেকেই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিল্পের সার্থক মিশ্রণ চেয়েছিলেন। একটির জন্য অপরটির সঙ্গে সমঝোতা করে শিল্পনির্মাণে তাঁদের বিরোধিতা ছিল। পাশাপাশি তাঁরা চেয়েছিলেন শিল্প-সংস্কৃতি নির্দিষ্ট দেশের জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও লোকশিল্পকে প্রাধান্য দেবে। গণনাট্য সংঘের নাটকের শিল্পচেতনার সাফল্য-ব্যর্থতা এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার করতে হবে। দেখতে হবে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ ও পার্টি-নির্দেশিত কর্তব্যসাধনের পাশাপাশি গণনাট্য সংঘের নাটকগুলি শৈল্পিক প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছিল কিনা?

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাংলা প্রদেশের নাট্যচর্চা শুরু হয়েছিল ১৯৪৩ সালে। বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'ল্যাবরেটরি' নাটক মঞ্চস্থ হলেও 'গণনাট্য'-এর স্বরূপ খোঁজার কাজ তখনও অপূর্ণ ছিল। কৃষক-শ্রমিকসহ প্রলেতারিয়েত শ্রেণির 'জৈব বিকাশ'[৫৩]-এর সঙ্গে বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্ক ও নির্ভরশীলতার চাবিকাঠির অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান ছিল। ১৯৪৪ সালে বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন' নাটক প্রযোজনার মাধ্যমে গণনাট্যের তাত্ত্বিক আদর্শ বাস্তব রূপ লাভ করে। একই সঙ্গে গণনাট্যের নাটকের একটি আদর্শ কাঠামো তৈরি হয়। সমকালে 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' নাটক যতটা সাফল্য লাভ করেছিল, পরবর্তীকালে ঠিক ততটাই প্রশ্নের মুখে পড়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ করার পর বিশ্বের কমিউনিস্টদের কাছে সাম্রাজ্যবাদ বনাম ফ্যাসিবাদের যুদ্ধ 'জনযুদ্ধ'-এ পরিণত হয়। ১৯৪১ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি 'জনযুদ্ধ নীতি' গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক ভাবচুক্তির ফলে ইংরেজ সরকার বিপদের মুখে পড়তে পারে, এমন প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে সিপিআই নেতা অজয় ঘোষ স্ট্যালিনের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে স্বীকার করে নিয়েছিলেন,

"ফ্যাসিস্ট-বিরোধী শক্তিকে আরও শক্তিশালী করার জন্যই আমরা ব্রিটিশের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় বাধা দিইনি।"[৫৪]

গান্ধীজির 'আগস্ট আন্দোলন'কে পঞ্চম বাহিনীর কাজ বলা কিংবা নেতাজিকে 'কুইসলিং' বা বিশ্বাসঘাতক আখ্যা দেওয়া আদতে বামপন্থীদের বিপক্ষে যায়। 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' নাটকে পার্টির তৎকালীন নীতি ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল।

'নবান্ন' নাটকে দুর্ভিক্ষের কারণ হিসেবে ইংরেজের পোড়ামাটির নীতির প্রসঙ্গে একেবারেই আসেনি, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাও করা হয়নি। জাপ-আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য প্রধান শুধু নিজের ফসল নষ্ট করেনি, গ্রামের আরও পাঁচজনকে প্রভাবিত করেছে। নাটকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও মজুতদারিকে দুর্ভিক্ষের মূল কারণ রূপে দেখানো হয়েছে। 'দুর্ভিক্ষ' প্রসঙ্গে আলোচনার সময়ে আমরা দেখেছি ইংরেজদের তোষামোদের কারণেই বাংলায় মজুতদারদের বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়। আর প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছিল শুধুমাত্র মেদিনীপুরে, তাহলে সমগ্র বাংলায় দুর্ভিক্ষের কারণ কী? মেদিনীপুর ছিল আগস্ট আন্দোলনের আঁতুড়ঘর। কৃষক আন্দোলনের প্রতি সমর্থন থাকলেও সেখানে যুধিষ্ঠির চরিত্রটিকে পঞ্চম বাহিনীর প্ররোচক রূপে দেখিয়ে সমগ্র আগস্ট আন্দোলনের ভূমিকাকেই গৌণ করে দেওয়া হয়েছে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন,

"ঘরে ব্রিটিশ শাসককে আড়াল করে যেমন কেবল জাপ-বিরোধিতার কথাই বলা হল, জনসাধারণকে শ্রমিক নেতৃত্বে জনযুদ্ধের জন্য সমাবেশ করা হল না—ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টাকেই সাহায্য করা হল... আগস্ট আন্দোলনকে পঞ্চম বাহিনীর কাজ বলে চিহ্নিত করে জাপানকে রুখতে গিয়ে সে সময় ফ্যাসি-বিরোধী গান ঘরে ঘরে পঞ্চম বাহিনী খুঁজে বেড়াতে লাগল। সে সময়কার অসার রাজনীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'নবান্ন' নাটক।"[৫৫]

একইভাবে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' নাটকে সাম্প্রদায়িক হিংসার পরিস্থিতিতে জাপানি আক্রমণ ও চিনের জয়গানের মধ্যে পার্টি-লাইনের উপস্থিতি প্রচ্ছন্ন থাকে না।

'নবান্ন'-এর প্রসঙ্গে বারবার ফিরে এসেছে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের কথা। 'নীলদর্পণ'-এ বলিষ্ঠ জীবনবোধ ছিল না, অত্যাচারকে বড়ো করে তুলে ভাগ্যের কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছিল। সমস্যার সমাধানের জন্য ইংরেজ শাসকের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়েছিল। কিন্তু উনিশ শতকে সামন্ততন্ত্র ও নব্য-পুঁজিবাদের দ্বন্দ্বের সময় ঔপনিবেশিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন নাটককার নীলকরদের অত্যাচারকে যথার্থভাবে তুলে ধরার সাহস দেখিয়েছিলেন। 'নবান্ন'-তে যন্ত্রণা আছে, কিন্তু যন্ত্রণার প্রকৃত কারণ তুলে ধরা হয়নি। ফলে সমাধানের পথও দেখানো সম্ভব হয়নি। 'নবান্ন'-এর সমাধান রূপে চাষিদের একত্রে গাঁতায় ঘাঁটা ও 'জোর প্রতিরোধ'-এর ডাক দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কার বিরুদ্ধে 'জোর প্রতিরোধ' সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়নি। তবে 'নবান্ন'-এ কেন শ্রেণিসংগ্রাম নেই, কেন কৃষকরা প্রতিবাদ করে না এই প্রশ্নগুলোর জন্ম হয়েছিল অনেক পরে। স্বাধীনতার পর রণদিভে নীতির সময়।

কিন্তু প্রশ্ন ওঠে তৎকালীন পার্টি-লাইনের প্রভাবে 'নবান্ন'-এর তথাকথিত ব্যর্থতা সত্ত্বেও নাটকটি কীভাবে এত জনপ্রিয় হয়েছিল? আজও 'নবান্ন' দুর্ভিক্ষের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি রূপে আমাদের সামনে উঠে আসে। তা কি শুধুই প্রযোজনার নৈপুণ্যে, নাকি নাটকটির মধ্যে কোন বৃহৎ জীবনসত্য লুকিয়ে আছে? 'নবান্ন' নাটকে যেভাবে লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি উঠে এসেছে, তা গণনাট্যের খুব কম নাটকের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। পরবর্তীকালে কৃষিজীবী শ্রেণির জীবনসংগ্রামকে তুলে ধরা ও তাকে শ্রেণিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে গণনাট্যের নাটকে লোকসংস্কৃতি ব্যবহারে একটা অদ্ভুত অনীহা দেখা দেয়। তার কারণ শিল্পীদের গ্রামজীবন সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা ও রাজনৈতিক বক্তব্য পেশ করার সরল ফর্মুলা আবিষ্কার। অন্যদিকে 'নবান্ন' রাজনৈতিক পরিভাষার সঙ্গে গ্রামীণ ভাষা, মূল্যবোধ, লোকাচার, গ্রামজীবনের ছোটো ছোটো সুখ-দুঃখ সম্পৃক্ত করে তোলার নাট্যরূপ তৈরি করেছিল। সর্বোপরি দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষের যন্ত্রণা বিজন ভট্টাচার্যকে ব্যাপকভাবে নাড়া দিয়েছিল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-অভিজ্ঞতা, মানুষের প্রতি সহানুভূতি, রাজনৈতিক আদর্শ ও লোকশিল্প সঞ্জাত শিল্পচেতনার সার্থক সম্মিলন ঘটেছিল 'নবান্ন' নাটকে। বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসে 'নবান্ন' প্রযোজনার স্বকীয়তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘের অন্যান্য শিল্পীদের নাটকে এতগুলি

উপাদানের যথাযথ মিশেল সম্ভব হয়নি। পার্টি ও রাজনৈতিক আদর্শের একপেশে তুলাদণ্ডে শিল্পের মান ক্রমশ নিম্নগামী হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের আলোচ্য সময়কালে গণনাট্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নাটককার ছিলেন দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর লেখা অসংখ্য নাটক গণনাট্য সংঘ অভিনয় করেছিল। কমিউনিস্ট পার্টির বেশ কিছু সিদ্ধান্তের সঙ্গে তিনি দ্বিমত পোষণ করতেন এবং তাঁর নাটকে সে কথা তুলেও ধরেছিলেন। ফলে গণনাট্যে সংঘের মঞ্চে তাঁর বেশ কিছু নাটক অভিনয়ের ছাড়পত্র পাওয়া যায়নি।

তেভাগা আন্দোলনের সময়ে অভিনীত 'তরঙ্গ' নাটকে নাটকটিতে মার্কসবাদী তত্ত্বের আলোকে শ্রেণিচরিত্রের বিকাশ, শ্রেণিসংগ্রামের গুরুত্ব এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তার পরবর্তীকালের ইতিহাসে কমিউনিস্টদের ভূমিকা গৌরবোজ্জ্বল করে দেখানো হয়েছিল। স্বাধীনতার লড়াই, কৃষক আন্দোলন ও গোরা সৈন্যদের আক্রমণের মধ্যেও মহীউদ্দিন-মঞ্জুরীর প্রেমকাহিনি এক লাল টুকটুকে সোনালি ভবিষ্যতের সম্ভাবনা নিয়ে উপস্থিত হয়। 'মশাল' নাটকে মতির অন্তর্দ্বন্দ্ব, ললিতার মাতৃত্বের শক্তি, শঙ্কর-শোভনলালদের আদর্শের দৃঢ়তার মধ্যে শ্রমিক আন্দোলনে রণদিভের 'ঝুটা-স্বাধীনতা' রাজনীতির ব্যর্থতা অত্যন্ত সূচারু ভঙ্গিতে ব্যক্ত হয়েছে। 'বাস্তুভিটা' নাটকে তিনি মহেন্দ্র মাস্টারের মানসিক টানাপোড়েন, দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের আলোয় সোনা মোল্লার উত্থান এবং নাটকের সমাপ্তিতে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের স্বপ্নীল ভবিষ্যৎ অঙ্কণ করেন।

তবে দিগিন্দ্রচন্দ্রের নাটকে শেষ পর্যন্ত তত্ত্বেরই জয় হয়। তত্ত্বের গণ্ডির মধ্যেই নাটকের সমস্যা ও সমাধানের পথ নির্মিত হয়। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সমস্যার চক্রব্যূহে নাটকের চরিত্রের পূর্ণতার চূড়ান্ত মাপকাঠি নির্ধারিত হয়। এমনকি সাম্প্রদায়িকতার মতো সমস্যার প্রসঙ্গ তাঁর নাটকে যেখানে এসেছে, সেখানে মনে হয়েছে কিছু সাম্প্রদায়িক ব্যক্তি জিগির তুলেছে মাত্র। অথচ মানুষের মনের অন্ধ-গহ্বরে সাম্প্রদায়িকতার বিষ যে দীর্ঘদিন ধরেই লালিত হয়েছিল, তা দাঙ্গার ইতিহাস দেখলেই স্পষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও আর্থিক সংগ্রামকেই তিনি সাম্প্রদায়িকতা সমাধানের শ্রেষ্ঠ পথ বলে মনে করেছিলেন। তাঁর 'কেউ দায়ী নয়' ও 'অন্তরাল' নাটকে বুর্জোয়া অপ-সংস্কৃতি অপসারণের

মধ্যে নারীস্বাধীনতার উত্তর খোঁজা হয়। কিন্তু শুধুমাত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পিতৃতান্ত্রিকতার মতো কুসংস্কারগুলির অপসারণ সম্ভব নয়। মার্কসবাদী আদর্শের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতার কথা স্বীকার করেও বলতে হয় মানবচরিত্রের ব্যাপ্তি আরও গভীর, আরও প্রশস্ত। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ তার একটি বিশেষ দিককে নির্দেশ করে মাত্র। সেই একটি দিকের প্রতি অতিরিক্ত নজর দেওয়ার ফলে গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত তাঁর নাটকগুলিতে জীবনের সার্বিক দিকটি উঠে আসে না। তিনি নিজেও স্বীকার করে নেন,

> "গণনাট্যের সঙ্গে একটা শিল্পগত মতভেদ ছিল আমার। তখন গণনাট্য সংঘে মানুষের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংগ্রামের ওপরই প্রাধান্য দেওয়া হত। অন্য দিকে নয়।"[৫৬]

তবে দিগিন্দ্রচন্দ্র তাঁর নাটকে যে 'টোটালিটি অফ লাইফ'-কে ধরতে চেয়েছিলেন, গণনাট্য প্রযোজিত তাঁর নাটকগুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। তার দায় সংঘ কর্তৃপক্ষ দ্বারা নাটক নির্বাচনে না গণনাট্য সংঘ নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির কারণে, তা বলা সম্ভব নয়। গণনাট্য প্রযোজিত তাঁর নাটকগুলির সাফল্য হল যে তিনি কাহিনি নির্মাণ, চরিত্র চিত্রণ, নাটকীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত নির্মাণের দক্ষতায় বাঙালি জীবনের মধ্যে মার্কসবাদী তত্ত্ব সার্থকভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন।

গণনাট্যের নাটকে দিগিন্দ্রচন্দ্রের যে সাফল্য, অনেক নাটককার সেই প্রচেষ্টাতেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। তুলসী লাহিড়ীর নাটক প্রসঙ্গে সুধী প্রধান যে 'আধসেদ্ধ মার্কসবাদী চর্চা'র[৫৭] কথা বলেছিলেন, তা যেন এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। আসলে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলার বহুবিধ সমস্যার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট ধারা অবলম্বন করে শিল্প-সংস্কৃতিচর্চা সম্ভব ছিল না। স্বাধীনতার মোহভঙ্গকে মেনে নিতে পারছি না, অথচ কী উপায়ে তার সমাধান সম্ভব তারও উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না। এই বিভ্রান্ত সময়ের বহুমুখী পরিসরকে চিহ্নিত করার জন্য নির্দিষ্ট রাজনৈতিক লাইনের বাইরে বেরিয়ে অনেকগুলি সত্তা আবিষ্কারের প্রয়োজন ছিল। বিশেষ করে ভাঙা বাংলার বুকের পাঁজরের উপর দাঁড়িয়ে প্রকৃত অর্থে বাঙালি নাট্যচেতনার সঙ্গে অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দাবির সংমিশ্রণ দরকার ছিল। সেই যোগসূত্র আবিষ্কারে প্রতিটি নাট্যমহলই কমবেশি ব্যর্থ হয়েছিল। গণনাট্যও অর্থনৈতিক-

রাজনৈতিক দাবির বাইরে বৃহত্তর বাঙালি জীবনের নাট্যচেতনার বিকল্প লক্ষ্য নির্ধারণ করে উঠতে পারেনি। কিংবা যেখানে প্রয়োগরীতির নৈপুণ্যে মানবাত্মার খোঁজ করা শুরু হয়েছিল সেখানেই সংঘ বা পার্টি পিছু টেনে ধরেছে। বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'রাহুমুক্ত' যাত্রানাটকে লোকশিল্পের প্রয়োগের সাফল্য সত্ত্বেও লোকআঙ্গিককে আর ব্যবহার করা হয়নি। ঋত্বিক ঘটকের 'দলিল' নাটকের পর দেশভাগ-উদ্বাস্তু জীবন নিয়ে আর নাটক প্রযোজিত হয় না। কিংবা গণনাট্য সংঘ ১৯৫৯-এর খাদ্য-আন্দোলন নিয়ে প্রায় নীরবতা পালন করে।

ফলস্বরূপ 'ফর্মুলা নাটক'-এর বাড়বাড়ন্ত শুরু হয়। নাট্য-সমালোচক সৌমিত্র বসু গণনাট্যের নাট্যরচনার পদ্ধতির সঙ্গে Sam Smiley-র Didactic Drama-র মিল খুঁজে পান। Smiley-র মতানুযায়ী Didactic Drama এক ধরণের সওয়াল পেশ করার কাজ করে। যার মাধ্যমে দর্শককে নিজের বক্তব্যের সপক্ষে নিয়ে আসা যায়। এই পদ্ধতি তিনভাবে কাজ করে। প্রথমত, Ethos বা নৈতিক প্রমাণ দিয়ে; দ্বিতীয়ত, Pathos বা ঘটনা বিন্যাসের মাধ্যমে; তৃতীয়ত, Logos বা যুক্তির মধ্যে দিয়ে। এই ধরণের নাটকের সিদ্ধান্ত পূর্বনির্দিষ্ট থাকে এবং চরিত্রদের একমাত্র কাজ থাকে সেই সিদ্ধান্তকে পরিপূর্ণ করা। ফলে কাহিনি ও চরিত্রনির্মাণের শৈলীতে এক ধরণের সরলীকরণ চলে আসে।[৫৮] গণনাট্যের অধিকাংশ নাটকই যে এই ধারায় রচিত এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ফ্যাসিবিরোধী শিল্পরচনার সময় যে Link Up ও Way Out-এর ধারণা তৈরি হয়েছিল, তা পরবর্তীকালেও প্রযোজ্য হয়েছিল। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বয়ান অনুযায়ী সমস্ত শিল্পকলার সঙ্গে সমস্যার 'Link Up' ও দুর্ভিক্ষের সময়ে ফসল উৎপাদন বাড়ানোকে 'Way Out' রূপে চিহ্নিত করার ফরমায়েশ আসত। স্বাধীনতার পর এই 'Way Out' হয়ে গেল পার্টি নির্দেশিত শ্রেণিসংগ্রামের পথ।

অধিকাংশ নাটকেই টানা নিপীড়ন-অত্যাচারের কাহিনি দেখানো হত এবং অবশেষে কমিউনিস্ট চরিত্রের আগমনে বা বামপন্থী মতাদর্শের প্রভাবে সমস্ত সমস্যা সমাধানের ডাক দেওয়া হত। ফলে সমাধানের সঙ্গে নাটকের মূল সমস্যার যোগসূত্র থাকত না। অর্থনৈতিক দাবি ও জনজাগরণের বক্তব্য থাকলেও নাট্যকাহিনি কৃত্রিম হয়ে যেত। কৃষক আন্দোলনের নাটক 'আমার মাটি'-তে সমস্যার ঘনঘটা বা 'অন্নপূর্ণার দেশে'-তে স্লোগানধর্মিতায় শ্রেণিসংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়।

কৃষি-অর্থনীতির লড়াইকে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াই রূপে দেখা শুরু হয়। শ্রমিক আন্দোলনের নাটক 'মৃত্যু নাই', 'দ্বান্দ্বিক' বা 'ইস্পাত' নাটকে জীর্ণতায় দীর্ণ শ্রমিকরা আচমকা রাজনীতির ডাকে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। 'স্পেশাল ট্রেন' নাটকটিতে পোস্টার ও স্লোগানের ধরণ অনুসরণ করা হয়। মধ্যবিত্ত জীবনের নাটকে দারিদ্র্যের মধ্যে বুর্জোয়া সমাজের স্বরূপ উন্মোচন ও বামপন্থী তত্ত্ব সংগ্রামের বক্তব্য নিয়ে আসে। 'নাগপাশ', 'হরিপদ মাস্টার', 'আজকাল', 'মোকাবিলা', 'জীবন যৌবন', 'একটি যুদ্ধের ইতিহাস' প্রভৃতি নাটকের প্লট একই বক্তব্যে ঘুরপাক খায়। 'মৃত্যুহীন' নাটকে বর্ণবিদ্বেষের সমস্যা বা 'নীলদরিয়া' নাটকে ডক শ্রমিকদের ব্যক্তিগত জীবনযন্ত্রণার মধ্যেও অনর্থকভাবে বামপন্থার জয়ধ্বনি ঘোষণা করা হয়। একপেশে কাহিনি, তত্ত্বপ্রচারের প্রবণতা, দুঃখচর্চার শেষে সমাধানের নামে পার্টির পতাকা পুঁতে দেওয়ার পদ্ধতি বড়োজোর সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে। গণনাট্য যেভাবে অবক্ষয়ের ঊর্ধ্বে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, মানুষের স্বাধীনতা ও অধিকারের জন্য লড়তে চেয়েছিল, এই নাট্যপদ্ধতির মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য কীভাবে সফল হতে পারে, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

রম্যাঁ রল্যা তাঁর 'গণনাট্য'-এর ধারণায় নাটকের মধ্যে যেভাবে বুদ্ধিদীপ্ততা ও আনন্দের উৎসারণ চেয়েছিলেন ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তাকে প্রয়োগ করতে পারেনি। কিংবা যেখানে দুটির মিশ্রিত প্রয়োগ ঘটাতে চেয়েছে, সেখানে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ত্রুটি রয়ে গেছে।[৫৯] শিল্পের শেষে বামপন্থী সমাধানের পথ জুড়ে দিতে হবে এমন দাবি কোনো মার্কসবাদী নন্দনতত্ত্ববিদ করেন না। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন কেউই বলেননি যে সমস্ত শিল্পেরই সামাজিক ভূমিকা বা রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকতে হবে। এঙ্গেলসের বক্তব্য ছিল শিল্প দেশ-কাল-পরিস্থিতির প্রতি দায়িত্ব পালন করে নান্দনিক ভূমিকা ও ঐতিহাসিক উদ্দেশ্যপূরণ একই সঙ্গে সাধিত করবে।[৬০] বিপ্লবের পরিস্থিতিতেও মাও চেয়েছিলেন,

> "রাজনীতি ও শিল্পের মধ্যে ঐক্য, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের মধ্যে ঐক্য, বৈপ্লবিক রাজনৈতিক বিষয়বস্তু এবং সর্বোচ্চ সম্ভব নিখুঁত শিল্পগত আঙ্গিকের মধ্যেকার ঐক্য। যেসব শিল্পগত রচনার শিল্পগুণের অভাব রয়েছে তা রাজনৈতিকভাবে যত প্রগতিশীলই হোক না কেন তা হয়ে পড়ে শক্তিহীন।"[৬১]

সাহিত্যে পার্টি-লাইনের অনুপ্রবেশ চেয়েও লেনিন কিন্তু শিল্প-সংস্কৃতিকে একরঙে দেখানোর বিরোধিতা করতেন। এমনকি শিল্প-সংস্কৃতির উপর পার্টি-লাইনের অন্যতম প্রবর্তক আরাগঁ পরে বলেছিলেন, "লেখকের শ্রেণিগত দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা এমন সব মূল্য সৃষ্টি হওয়া আবশ্যক, যা তাঁর শ্রেণিসীমানার বাইরেও স্বীকৃতিলাভ করবে।"[৬২] ভারতীয় গণনাট্য সংঘের অধিকাংশ নাটক এই উচ্চতায় উঠতে পারেনি। রাজনৈতিক বিপ্লবের বন্ধু হতে গিয়ে উত্তেজনা ও প্রত্যক্ষ সংঘাতকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং এই পথে পার্টির সাফল্য আসায় রাজনৈতিক আদর্শকে জীবনের সত্যের সঙ্গে যাচাই করে দেখার প্রবণতাও ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে। ব্যক্তির ভূমিকা ক্রমে হারিয়ে যায়। শিল্পীর ব্যক্তিত্বের ছাপের বদলে বাস্তব ঘটনাকে হুবহু রাজনৈতিক তত্ত্বে রাঙিয়ে উপস্থাপিত করা শুরু হয়। ১৯৬৫-র পর এই অবস্থা আরও বৃদ্ধি পায়। ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল প্রযোজনা অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু তার সংখ্যাও সীমিত এবং নবনাট্য-গ্রুপ থিয়েটারের দাপটে সেটুকুর উপরেও প্রত্যাশিত আলোকপাত করা হয়নি।

অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক বিষয়ের উপর অতিরিক্ত জোর দেওয়ার ফলে নাটকে শুধুই 'বার্নিং প্রবলেম' নিয়ে কথা হয়েছে। তাও শুধুমাত্র শহরে, গ্রামের সমস্যা মানেই একমাত্র কৃষি-অর্থনীতির সমস্যা। শ্রেণিচেতনার প্রাবল্যে মানুষের জাতিগত-ধর্মগত সমস্যা প্রায় মুছে গিয়েছে। ফলে চোরা-সাম্প্রদায়িকতা বা জাতিগত বৈষম্য নিয়ে কোনো নাটক প্রযোজিত হয়নি। ধর্মান্ধতা, বর্ণভেদ, নারী-পরাধীনতার প্রসঙ্গ গণনাট্যের নাটকে আসেনি। সমাজতন্ত্র এলেই কি এক লহমায় এই সমস্যাগুলি দূরীভূত হয়ে যাবে? তার বিরুদ্ধে যে দীর্ঘ সংগ্রাম প্রয়োজন সে বিষয়ে গণনাট্য সচেতনতা দেখাতে পারেনি। বাংলার মনীষীরা তাঁদের চিন্তায়-কর্মে-রচনায় বহুদিন থেকেই এই সমস্যাগুলির বিরোধিতা করেছিলেন। গণনাট্য সংঘ এই সমস্যাগুলি নিয়ে নাটক রচনা করেনি এবং বাংলার নাট্য-ঐতিহ্যকে ব্যবহার করার কথাও ভাবেনি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রথের রশি' নাটকে জাতিভেদ-বর্ণভেদ, 'অচলায়তন', 'বিসর্জন' নাটকে অন্ধ কুসংস্কার, 'মুক্তধারা'য় সামন্ততন্ত্রের তীব্র বিরোধিতা করা হয়েছে। এমনকি 'চিরকুমার সভা'র মতো হাস্যকৌতুকের নাটকেও নারীস্বাধীনতার প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস গ্রামীণ সামাজিক সমস্যাগুলির বিশ্বস্ত প্রতিলিপি, শুধু

শ্রেণিসংগ্রামের মাধ্যমে কৃষি-অর্থনীতিতে পরিবর্তন এই সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারে না। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মন্মথ রায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়দের নাটকে উল্লেখিত সামাজিক সমস্যাগুলিকেও গুরুত্বের সঙ্গে দেখা হয়নি। বৃহত্তর গণনাট্য আন্দোলনকে উদ্দেশ্য করে উৎপল দত্ত লিখেছেন,

> "গণনাট্য আন্দোলনের মঞ্চ থেকে যদি কোনো প্রযোজক ইবসেনের 'এনিমি অব দি পিপল' করতে চান, তিনি কি তা করতে পারেন? কিংবা 'দেরি নাই', 'আর নয়' বা 'নাগপাশ'-এর মতো নগণ্য নাটক কী করে গণনাট্যের মঞ্চে স্থান পায়? অথচ নারী সমাজের দাসত্বের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের কোনো নাটক মঞ্চস্থ করার কথা আমরা চিন্তা করি না। কী করেই বা সম্ভব হল যে হিন্দু কোড বিলের ওপর কোনো নাটক করা হল না।"[৬৩]

নাট্যকাহিনি নির্মাণের মতো গণনাট্যের নাটকের চরিত্রগুলিও একটি ছাঁচে বাঁধা পড়ে গিয়েছিল। একথা ঠিক যে গণনাট্যের হাত ধরেই বাংলা নাটকে একক চরিত্রের বদলে জনগণের জয়যাত্রা সূচিত হয়েছিল। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘাত ক্রমে সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সঙ্গে জনগণের সংঘাতে পরিণত হয়েছিল। অসংখ্য চরিত্রের ব্যক্তিগত জীবনযন্ত্রণা ও দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশকে একটি রাজনৈতিক আদর্শে ঘনপিনদ্ধ করে গণসংগ্রামে উজ্জীবিত করার ধারণার ফলে বাংলা নাটকে নবদিগন্ত উন্মোচিত হয়েছিল। তথাকথিত শ্রেণিসংগ্রাম না থাকলেও 'নবান্ন' নাটকের কৃষকরা নিজেদের দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল। 'তরঙ্গ' বা 'মশাল' নাটকের চরিত্রচিত্রণেও একই ছবি উঠে আসে। 'সংক্রান্তি' নাটকে যুগ-পরিবর্তন ও দুটি যুগের সংঘাতের চিত্র চরিত্রদের মধ্যে ফুটে ওঠে। রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সমস্যা কীভাবে তার জীবনকে জীর্ণ করে বৃহত্তর গণসংগ্রামের পথে নিয়ে আসে সে বিষয়ে গণনাট্যের নাটকগুলি নৈপুণ্য দেখিয়েছে। কিন্তু প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই চরিত্রকে উদ্বুদ্ধ করতে বাহ্যিক সংঘাতের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। মানুষ বলতে শুধুমাত্র তার শ্রেণিগত অবস্থানকে গুরুত্বের সঙ্গে বিচার করা হয়েছে, তার ব্যক্তিগত অন্তর্দ্বন্দ্বের গভীরতায় পৌঁছোনোর চেষ্টা করা হয়নি। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় দেখেছিলেন গণনাট্যের নাটকে,

"পারিবারিক বা সামাজিক জীবনের সত্তা থাকে না চরিত্রগুলিতে। বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন, ছিন্নমূলের মতো মনে হয় তাদের। বিপ্লবী বাকতরঙ্গে হাবুডুবু খাওয়া একেকটি মানুষ। নাট্যকার একেকটি চরিত্র দিয়ে যা খুশি তাই বলান, যা খুশি তাই করান।"[৬৪]

কোন আত্মিক টানে একজন মানুষ তাঁর চিরাচরিত সংস্কার মুছে সংগ্রামের শরিক হয়ে ওঠেন, তার হদিশ অধিকাংশ নাটকেই পাওয়া যায় না। মানুষের সামাজিক সত্তা তুলে ধরতে গিয়ে মানুষের ব্যক্তিসত্তাকে প্রায় মুছে দেওয়া হয়েছে। ফলে গণনাট্যের অসংখ্য নাটকের অসংখ্য চরিত্রের আনাগোনার মধ্যে সার্বিক মানবচরিত্রের বড্ড অভাব দেখা যায়। সুধী প্রধানের মতে,

"লক্ষ্য করা যায় যে পনেরো বছরের মধ্যেই এই নাট্য আন্দোলনের ফলে নাটকে কৃষকের বদলে শ্রমিক এবং যেহেতু আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত যে পরিমাণ গ্রাম জানেন সে পরিমাণে শ্রমিক বস্তি জানে না, তাই নাটকে নকল শ্রমিক থেকে ডালহৌসি স্কোয়ারের বিপ্লবী কেরানি শ্রমিক, পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত ঘরের বাস্তুহারা প্রভৃতির প্রাধান্য দেখা গেল। কৃষক জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে এই নাটকগুলি দ্রুত ফর্মুলা নাটকে পরিণত হল।"[৬৫]

নাটকের কমিউনিস্ট চরিত্রগুলি বা বামমনোভাবাপন্ন চরিত্রগুলিকে সর্বাঙ্গীণ সুন্দর করে তুলতে গিয়ে প্রায় জড়পদার্থে পরিণত করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, দুর্বলতা নেই। কিংবা থাকলেও জাদুবলে তার থেকে মুক্তি পেয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। যেহেতু তাঁরা কৃষক-শ্রমিক বিপ্লবের ধ্বজাবহন করে, তাই তাঁরা মহান। 'আজকাল' নাটকের অশোক আকস্মিকভাবে বামপন্থী নেতা হয়ে সমস্ত দুর্বলতার ঊর্ধ্বে উঠে যায়। 'নাগপাশ' নাটকে বিনয়ের চাকরি যাওয়ার পর বা 'মৃত্যু নাই', 'দ্বান্দ্বিক' নাটকে কারখানায় ধর্মঘটের পর বাকি চরিত্ররা শ্রেণিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। 'কর্মখালি'-তে সবচেয়ে বুদ্ধিমান ব্যক্তিটি কমিউনিস্ট, 'আজব দেশ'-এ কৃষক নেতা কিষণচাঁদ বা 'আমার মাটি'-র কৃষক নেতা বৃন্দাবন সর্বগুণসম্পন্ন চরিত্র, 'একটি যুদ্ধের ইতিহাস'-এ একমাত্র কমিউনিস্ট চরিত্রটিই মতামত বিক্রি করে না, 'হরিপদ মাস্টার'-এর সত্যবাবু প্রায় স্লোগানের ভঙ্গিতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন, 'অন্নপূর্ণার দেশে' বা 'আত্মহত্যা আইনি কর' নাটকে কমিউনিস্ট চরিত্ররা কিছুতেই

ভেঙে পড়ে না। এই তালিকা ক্রমেই দীর্ঘ হবে। মূল কথা হল গণনাট্যের নাটকে অধিকাংশ কমিউনিস্ট চরিত্রকেই ভুলভ্রান্তির ঊর্ধ্বে দেখানো হয়েছে, যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নাটকের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সংঘাতে অণুঘটকের কাজ করে।

কিন্তু মানুষ কোনো 'অমৃতস্য পুত্রা' নয়—রাজনৈতিক-সামাজিক অভিঘাত সে বড়ো জোর মেনে নিতে পারে। তার আজন্মলালিত ভালো-মন্দ বৈশিষ্ট্যগুলিকে এক কথায় ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া সম্ভব নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর সব কিছু সুন্দর হয়ে যাবে, মানুষ আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠবে। তার স্বভাব ও চরিত্রের বিকাশ আদর্শায়িত পথে হবে। এই ধারণা থেকেই নতুন সমাজের প্রতিভূদের অতিমানব করে অঙ্কণ করা হয়েছিল। যদি ধরেও নেওয়া যায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সমস্ত সমস্যার সমাধান তবুও দুটি সমাজব্যবস্থার দ্বন্দ্ব, একটি অর্থনীতিকে বাতিল করে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার আগমন, রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিচালন পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তন মানবমনে কীভাবে প্রভাব ফেলতে পারে, তার রূপ নির্ণয় প্রয়োজন ছিল। বিরাট পরিবর্তনের সামনে দাঁড়িয়ে একক মানুষের প্রতিনিয়ত অন্তর্ঘাত, তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সমাজব্যবস্থার সংযুক্ত হওয়া, তাঁর গ্রহণ-বর্জনের দ্বন্দ্ব তাঁকে কীভাবে সমাজতন্ত্রের সঙ্গী করে তুলতে পারে সেই গভীরতার সন্ধান করা হয়নি। কার্যক্ষেত্রে সকল চরিত্রকেই যান্ত্রিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। উৎপল দত্ত জপেন দার জবানিতে লিখেছেন,

> "...বিপ্লবী তো যন্ত্র নয়, দানব নয়, দেবতা নয়, মানুষ। গভীরতম মানবপ্রেমে সে ডুবে আছে।... সর্বহারার নেতারা অতিমানব নন, তাঁরা স্নেহ-প্রেম মায়া-মমতা সম্বলিত আমাদের পাশের বস্তির মানুষ।... যারা প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লব করে, তারাই জানে ত্রিশঙ্কুর দোদুল্যমানতা কখনো না কখনো আসবেই, ভয় হবে, হত্যা করতে গিয়ে এক মুহূর্ত বোমাচাপা হাতটা ভিজে উঠবেই।... ওই দেবতাদের দেখে চাষি-মজুর কী ভাবে?—ভাবে, আমি এ-জন্মে অমন হইতে পারব নি বাপু! ই কি রে ভাই? ই তো দেখি পরমপুরুষ, অবতার, এ বউরে ঠেঙায় নে; বাপের সোংগে ঝগড়া করে নে, খেতে দিতে না পেরে পিটিয়ে বাচ্চাগুলোনরে চুপ কইরে রাখেনে! এই যদি বিপ্লবী হয়, তয় আমি বিপ্লবী হইতে পারবোনি। বিপ্লবী হওয়া মোর পক্ষে সম্ভবই নয়!"[৬৬]

বাস্তবিক গণনাট্যের খুব কম নাটকের বামপন্থী চরিত্রদের মধ্যে মানবিক বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ নৈপুণ্যের সঙ্গে দেখানো হয়েছে। মার্গারেট হার্কনেসকে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস বলেছিলেন যে প্রতিভূস্থানীয় চরিত্রের মধ্যে বাস্তবের নিষ্ক্রিয় প্রতিবিম্বন প্রয়োজনীয় নয়।[৬৭] কিন্তু গণনাট্যের নাটকগুলিতে 'টাইপ' চরিত্র তৈরি করতে গিয়ে রাজনৈতিক আদর্শ ও বাস্তবের হুবহু প্রতিবিম্বের অসংযত মিশ্রণ ঘটেছিল। মানবিক গুণাবলি ছাড়াও তার মধ্যে 'টাইপ' চরিত্রের শ্রেণিবিশ্লেষণ অনুপস্থিত ছিল। ফলে মন্দ চরিত্র মানেই নারকীয় দানব, অ-বাম চরিত্র মানেই প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রগতিশীল চরিত্র মানেই 'পুরুষ-সিংহ' হয়ে উঠেছে।[৬৮] মন্দ চরিত্রের বিশদ ও জীবন্ত চরিত্র আঁকতে গেলেই 'পার্টি-ব্যুরোক্রাট'রা নানারকম আপত্তি-অভিযোগ তুলতেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল মন্দকে বাড়িয়ে দেখে প্রলেতারীয় ভাবদর্শের বিরোধিতা করা হচ্ছে।[৬৯] কিন্তু পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ বা সামন্ততন্ত্র কোনোটাই তো কাগুজে বাঘ নয়। তারা প্রতি মুহূর্তে ওৎ পেতে বসে থাকছে সমাজতন্ত্রের দুর্বলতার রন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে মানুষের ক্ষতি করার জন্য। এই অবস্থায় তাদের ছোটো করে দেখানোর অর্থ আসন্ন বিপদকে ছোটো করে দেখানো। ফলে ভালো-মন্দ তথা সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব হয়ে পড়ছে কৃত্রিম, ঠুনকো।

গণনাট্যের পক্ষ থেকে অবশ্য যুক্তি ছিল যে তারা গ্রামে-গঞ্জে সরাসরি জনতার মধ্যে গিয়ে নাটক করেন। সেই নাটকে আশু রাজনৈতিক সাফল্যকে তারা প্রাধান্য দেন। মঞ্চব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য তারা আঙ্গিককে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারেননি। হীরেন ভট্টাচার্য মেনে নিয়েছেন যে গণনাট্যের নাটক 'Too Direct'। কারণ শহরের 'পেটি-বুর্জোয়া', 'সফিস্টিকেটেড' দর্শক যে সূক্ষ্মতা বোঝেন গ্রামের মানুষ বা শ্রমিক-কৃষকদের কাছে সেই সূক্ষ্মতার পরিবেশন নিরর্থক। শহুরে দর্শককে আঁচ দিলেই তাঁরা বুঝে নিতে পারেন, কিন্তু গণনাট্যের দর্শকদের বারবার বুঝিয়ে দিতে হয়। তবেই তাঁরা উজ্জীবিত হন।[৭০] কিন্তু লোককথা, যাত্রা, পাঁচালিতে কোথাও মোটা দাগে নীতিবাক্য বলে দেওয়া হয় না। পৌরাণিক কাহিনির আড়ালে, লোকগানের সুরে, বিবেকের বাণীর রূপকের মধ্যে থেকেই গ্রামীণ জনতা তাঁর প্রাণের স্পর্শ খুঁজে নিয়েছে। তাই গ্রামের মানুষ সূক্ষ্মতা বোঝে না, এই ধারণা সম্পূর্ণ সত্যি নয়। প্রয়োজন ছিল নিজস্ব সূক্ষ্মতা আবিষ্কার। যা গণনাট্য সংঘ করে উঠতে পারেনি।

রাষ্ট্র বনাম সংঘ—নাট্যনিয়ন্ত্রণ আইনের ফাঁস :

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জনপ্রিয়তার ক্রমবৃদ্ধি ও তাকে পাথেয় করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টা দেশের ক্ষমতাশীল দলের চিন্তার বিষয় হয়ে উঠেছিল। তাই রাষ্ট্রব্যবস্থা বার বার গণনাট্য সংঘের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে। কমিউনিস্ট পার্টির বেআইনি সময়ে কংগ্রেস পরিচালিত কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার দ্বারা পুলিশি অত্যাচার বা শারীরিক আক্রমণ তো ছিলই, তার সঙ্গে রাষ্ট্রের পকেটে লুকনো তাসটির নাম ছিল ইংরেজ সরকার প্রবর্তিত 'নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন'। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রবর্তিত অভিশপ্ত আইনকে স্বাধীন দেশের জনতার সমস্যাকীর্ণ নাট্যপ্রযোজনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে রাষ্ট্রব্যবস্থা পিছ-পা হয়নি।

১৮৭৬ সালে ইংরেজ সরকার বাংলা থিয়েটারের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ভ্রূণে হত্যা করার জন্য 'নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন' জারি করে। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী', 'সতী কি কলঙ্কিনী', 'গজদানন্দ ও যুবরাজ', 'Police of Pig and Sheep' প্রভৃতি নাটক ইংরেজ সরকার অশ্লীলতা ও কুরুচির দোহাই দিয়ে নিষিদ্ধ করে দেয়। মূল উদ্দেশ্য ছিল বাংলা থিয়েটারের টিনের তলোয়ারকে ভোঁতা করে মানুষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে উৎপাটিত করা। পরবর্তীকালেও দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মন্মথ রায়ের একাধিক নাটক, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের নাট্যরূপকে বাজেয়াপ্ত ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে বাংলা তথা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। আইনি বিধিনিষেধের দাপটে বাংলা থিয়েটারের প্রতিবাদী চেতনা ম্রিয়মাণ হয়ে ধর্মীয় ও সামাজিক নাটকের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা বাংলা থিয়েটারকে নতুন করে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংগ্রামের প্রতি দায়বদ্ধ করে তোলে। কিন্তু পরাধীন দেশে আইনি জটিলতার সঙ্গে লড়াই করে স্রোতের বিরুদ্ধে পথচলার বিপদ রয়েছে। বিশেষ করে এমন একটা সময়ে যখন ইংরেজ সরকার আগস্ট আন্দোলনকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেছে এবং কমিউনিস্ট পার্টি 'জনযুদ্ধ নীতি'র কারণে সরাসরি ইংরেজ-বিরোধী পদক্ষেপ নিতে দোলাচলে ভুগছে। পুলিশি হস্তক্ষেপ থেকে বাঁচতে গণনাট্য

সংঘের কালজয়ী প্রযোজনা 'নবান্ন' নাটকেও একাধিক পরিবর্তন করা হয়। নাটকটি প্রযোজনাকালে বন্দুকের গুলির শব্দের পরিবর্তে 'পোড়া বাঁশের গাঁট পোড়ানোর শব্দ' ব্যবহার করা হয়েছিল।[৭১] দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দীপশিখা' নাটকটি দিল্লি গণনাট্য সংঘ মঞ্চস্থ করতে চাইলে লালফিতের বাঁধন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। একইভাবে ১৯৪৫ সালে 'নীলদর্পণ' নাটকের সম্পাদিত রূপটিকে প্রযোজনা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

স্বাধীনতার পর বাংলা থিয়েটারমহল আশা করেছিল 'নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন'-এর অবসান ঘটবে। স্বয়ং নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ি স্বাধীন ভারতবর্ষে এই আইনের বিরোধিতা করে বলেছিলেন, "নাটক বিচারের ভার পুলিশের হাতে রেখো না।"[৭২] কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির 'ঝুটা স্বাধীনতা' নীতির ফলে গণনাট্য সংঘের উপর পুলিশি আক্রমণ ও আইনি বিধিনিষেধের প্রকোপ আরও বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গণনাট্য সংঘের একটি সভায় দুষ্কৃতিদের গুলিতে সুশীল মুখার্জি ও ভবমাধব ঘোষের মৃত্যু ঘটে।[৭৩] ১৯৪৯ সালে একটি গোপন সরকারি সার্কুলারে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের গণনাট্য সংঘের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে নিষেধ করা হয়। সার্কুলারে পুলিশকে গণনাট্যের নাট্যচর্চার উপর নজর রাখতে বলা হয়েছিল। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটকে নাট্যাভিনয় আইনের প্রয়োগের নাট্যাভিনয় বন্ধ ও নাটক বাজেয়াপ্ত করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়।[৭৪]

সার্কুলার জারি করে নাট্যপ্রযোজনার উপর লাগাম পরানো ছাড়াও 'পরিচয়' ও 'লোকনাট্য' প্রভৃতি পত্রিকা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। পুলিশ ৪৬ নং ধর্মতলা স্ট্রিটে হানা দিয়ে গণসঙ্গীতের সংকলন 'জনসঙ্গীত' বাজেয়াপ্ত করে। অন্ধ্রের গণনাট্য সংঘের নাটক 'মা-ভূমি', গুরুদাস পালের গান 'শুনেছ কি কলকাতার খবর', বিনয় রায়ের গান 'আর কতকাল' প্রভৃতি শিল্পকর্মগুলি নিষিদ্ধ করা হয়। ১৯৪৯ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মুসলিম ইনস্টিটিউটে গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত 'মৃত্যু নাই' নাটকটির অভিনয় চলাকালীন পুলিশ বন্ধ করে দেয়।[৭৫] 'মঞ্জিল', 'সংকেত', 'তরঙ্গ' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় চলাকালীন পুলিশি আক্রমণ নেমে আসে। গণনাট্য সংঘের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শিল্পী ও সংগঠক অনিল ঘোষ লিখেছেন যে কাকদ্বীপের তেভাগা আন্দোলন নিয়ে লেখা 'নয়ানপুর' নাটকটি অভিনয়ের পর

নিরাপত্তার খাতিরে পুড়িয়ে ফেলা হত।[৭৬] সলিল চৌধুরীর একাধিক নাটকেরও একই পরিণতি হয়েছিল।

১৯৫২ সালে সর্বভারতীয় গণনাট্যের বোম্বাই সম্মেলনে আইনটিকে 'ভারতের সংস্কৃতির শৃঙ্খল' বলে উল্লেখ করে অপসারণের দাবি করা হয়। কমিউনিস্ট পার্টি আইনি হওয়ার পরে গণনাট্যের উপর পুলিশি বিধিনিষেধ কমে গেলেও অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। বহরমপুরে 'হরিপদ মাস্টার' নাটকটি অভিনয়ের সময় পুলিশের আগমন ও নাটক বন্ধ করে দেওয়া তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ১৯৫৩ সালের ১০ নভেম্বর বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে এমএলএ মণিকুন্তলা সেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে গণনাট্য সংঘের নাটকের উপর তদন্তের বিধিসম্মত কারণ জানতে চান। উত্তরে বিধানচন্দ্র রায় জানান যে ১৮৭৬-এর নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের ৭ নং ধারায় উক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাঁর মনে হয়েছিল গণনাট্য সংঘ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গল্প-উপন্যাসগুলির কাহিনি নিজেদের আদর্শ অনুযায়ী বদলে নিত।[৭৭] কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জ্যোতি বসু ও মনোরঞ্জন হাজরা বিতর্কে যোগ দেন। এক সময়ে আলোচনা প্রায় ব্যক্তিগত কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির পর্যায়ে নেমে আসে।[৭৮] বিধানচন্দ্র রায় সন্দেহভাজন ৫৯টি নাটকের তালিকা পেশ করেন। এই ৫৯টি নাটকের মধ্যে ২৭টি নাটক গণনাট্য সংঘ বিভিন্ন সময়ে অভিনয় করেছিল। সেগুলি হল,

> সব পেয়েছির দেশ, নয়ানপুর, মৃত্যু নাই, ডাক, সংকেত, মঞ্জিল, নীলদর্পণ, অরুণোদয়ের পথে, ঢেউ, নবান্ন, ইন্ডিয়া ইমমরটাল, শহীদের ডাক, বিসর্জন, অফিসার, বিচার, আবাদ, চার্জশিট, নাগপাশ, নাটক নয়, জনক, ধরতি কে লাল, অহল্যা, দলিল, ভাঙা বন্দর, উদয়াস্ত, জবানবন্দি, মাউন্টব্যাটেন কাব্য।[৭৯]

নাটকগুলির রাজনৈতিক বক্তব্য বিচার ও বাজেয়াপ্ত করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল বাংলার সংস্কৃতি সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞানশূন্য পুলিশকর্মীদের। তালিকার নাটকগুলি দেখলেই তাদের সাংস্কৃতিক বোধের

অভাব ও অতিসক্রিয়তার নমুনা পাওয়া যায়। নাটক বাজেয়াপ্ত করা নিয়ে সুধী প্রধান একটি অদ্ভুত কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক কাহিনি লিখেছেন,

> "তারা 'নীলদর্পণ'-এর নাট্যকারকে লালবাজারে যেতে আদেশ করেছিল। তারা গণনাট্য সংঘের কাছে—(১) সিল্ক শাড়ি, (২) কাঁচরাপাড়া, (৩) পাঁঠা ও (৪) তুলসী লাহিড়ী নামক নাটকের পাণ্ডুলিপি চেয়ে পাঠায়!! পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাট্য-সাহিত্যের প্রতি কি অপরিসীম অবজ্ঞা থাকলে এই ধরণের বিভাগের হাতে নাটক সেন্সরের ভার দিতে পারে তা যেন সঙ্গীত-নাটক আকাদেমির সদস্যরা ভেবে দেখেন।"[৮০]

প্রসঙ্গত একই সময়ে থপিল ভাসি-র লেখা ও কেরালা পিপলস আর্ট ক্লাবের প্রযোজিত 'নিঙ্গালেন্নে কমিউনিস্টাকি' বা 'তুমি আমাকে কমিউনিস্ট করেছ' নাটকটি কেরল সরকার নিষিদ্ধ করে।

১৯৫৭ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনের অধিকাংশ ধারাকে 'সংবিধান বহির্ভূত' ঘোষণা করে। তবে আইনটিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করা হয়নি।[৮১] ১৯৬২ সালে প্রফুল্ল সেন সরকার পুরনো আইনটিকেই আরও কঠোরভাবে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক পারফরমেন্স বিল' চালু করার চেষ্টা করে। সেই সময়ে চিন-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে বাংলার কমিউনিস্টদের একটা অংশ এমনিতেই কোণঠাসা। বাংলার সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরাও কমিউনিস্ট বিরোধিতা শুরু করেন। কিন্তু নতুন নাট্যবিলের বিপদ শুধু গণনাট্য সংঘ বা কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন নাট্যদলগুলির একার ছিল না। 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ড্রামাটিক পারফরমেন্স বিল' বাম-ডান, গণ-নব নির্বিশেষে বাংলার সমস্ত নাট্যদলের ক্ষেত্রেই অশনিসংকেত নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল।

আইনের একটি অংশে বলা হয়েছিল,

"3. 'Objectionable Performance' means a performance which is—

(a) likely to incite—

(i) any person to resort to violence or sabotage for the purpose of overthrowing or undermining the Government or its authority in any area; or

(ii) any person to commit murder, sabotage or any offence involving violence"[৮২]

অর্থাৎ নাটকে কোনো রকম হিংসাত্মক ঘটনা খুন বা ওই জাতীয় দৃশ্য দেখানো যাবে না। সরকারবিরোধী কোনো পদক্ষেপ, সরকারের নীতির সমালোচনা বা সরকার বিপদে পড়তে এমন কোনো ঘটনা মঞ্চে উপস্থাপনা করা যাবে না। আইনটির 'Explanation 1'-এ সরকার-বিরোধিতা বলতে কী বোঝানো হয়েছে, তার দীর্ঘ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছিল। আইন অমান্য করলে ছয় মাসের কারাদণ্ড বা জরিমানা অথবা উভয়েই হতে পারে। ১৮৭৬ সালের আইনে লোকআঙ্গিক প্রযোজনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু ১৯৬২-র আইনে যাত্রা, কবিগান, তরজা, কথকতা, কীর্তনের মতো লোকআঙ্গিকগুলিকেও ছাড় দেওয়া হয়নি। তার সঙ্গে ছিল 'লাইসেন্স' সংক্রান্ত অহেতুক জটিলতা।

বিলের খসড়া প্রকাশিত হওয়ার পর বাংলার নাট্যব্যক্তিত্বরা তীব্র প্রতিবাদ জানান। ১৯৬৩ সালের ৭ জানুয়ারি নাট্যকার মন্মথ রায়ের অভিভাবকত্বে বিলের বিরোধিতায় একটি সম্মেলন ডাকা হয়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন দেবনারায়ণ গুপ্ত, সুধী প্রধান, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ ছাড়াও বহুরূপী, এলটিজি, থিয়েটার ইউনিট, প্রান্তিক, শৌভনিক, গন্ধর্ব, ক্রান্তি শিল্পী সংঘ প্রভৃতি নাট্যদল সংঘবদ্ধ হয়ে বিলটিকে ধিক্কার জানায়। ১৩ মে মন্মথ রায়ের সভাপতিত্বে কলকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে 'সারা বাংলা নাট্যানুষ্ঠান বিল আলোচনা সম্মেলন'-এর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তার কিছুদিন পর গণনাট্যের পক্ষ থেকে বিলটির প্রতিবাদ করে বলা হয়,

"বাংলার নাট্যশালার প্রাণশক্তি হরণের জন্য যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীরা কুখ্যাত নাট্যানুষ্ঠান আইনের প্রবর্তন একদা করেছিল সেই নাট্যশালা মরেনি—মরবে না। কিন্তু ভারত থেকে সেই সাম্রাজ্যবাদীদেরই বিদায় নিতে হয়েছে। আজকে ক্ষমতাদর্পে দর্পিত হয়ে শাসক গোষ্ঠী যদি বাংলাদেশের নাট্যজগতের কণ্ঠরোধ করতে উদ্যত হন তবে সে কণ্ঠ শতগুণে গর্জে উঠবে।"[৮৩]

বাংলা থিয়েটারের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের মুখে দাঁড়িয়ে সরকার বিলটি প্রত্যাহার করে নেয়। কিন্তু তারপরেও গণনাট্য সংঘের বিভিন্ন নাটকের উপর আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত থেকেছে। অনেক সময়ে রাষ্ট্রের অতিসক্রিয়তা আইনি পথ পেরিয়ে অনৈতিক পথেও বাধাদান করেছিল। অন্যান্য বামমনোভাবাপন্ন নাট্যদলগুলিও আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়নি। সাতের দশকে এই অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি পায়। সে ইতিহাস আরও বিস্তৃত, আরও মর্মান্তিক।

ব্যক্তি বনাম গোষ্ঠী :

মহাকবি গ্যেটে ইয়োহান আকারম্যানকে ভয় দেখিয়েছিলেন যে, রাজনীতি কবির অপমৃত্য ঘটাতে পারে। আবার 'কালান্তর' গ্রন্থের 'বাতায়নিকের পত্র'-এ রবীন্দ্রনাথ মানুষের জন্য একটা ফাঁকা উঠোনের খোঁজ করেছিলেন। সত্যিকারের 'ধনী' ওই ফাঁকটাকে বড়ো করে রাখতে পারে।[৮৪] প্রাত্যহিক জীবনের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক দাবিদাওয়া পূরণ মানুষকে ঘরের আশ্রয় দিতে পারে। কিন্তু ব্যক্তি মানুষের পূর্ণতার জন্য ওই উঠোনের ফাঁকটুকু দরকার। বিশেষ করে সেই ব্যক্তি যদি শিল্পী হন, তবে তিনি সেই ফাঁকটুকু চাঁদের আলোয় পূর্ণ করে তোলার স্পর্ধা দেখাতেই পারেন। ফলে ব্যক্তির সঙ্গে রাষ্ট্র তথা যে কোনো সংগঠিত ব্যবস্থার দ্বন্দ্বের ইতিবৃত্ত নতুন কিছু নয়।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এক বিরাট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এগোতে গেলে বিভিন্ন ব্যক্তির শিল্পাদর্শের মধ্যে মতপার্থক্য খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। তার সঙ্গে

রাজনৈতিক আনুগত্যের অনুপ্রবেশ মতপার্থক্যকে ক্রমশ বিরোধিতার পর্যায়ে নিয়ে যায়। বিজন ভট্টাচার্যের ভাষায়,

> "রাজনীতিক দেখবেন এক চোখে। কেন না দু-চোখ খুলে দেখবার ব্যাপারটা তাঁর ধর্মে বারণ আছে। কিন্তু শিল্পী দেখবেন তাঁর খোলা দু-চোখে। সাধারণ মানুষের জান-এর লড়াই-এর সঙ্গে প্রাণের লড়াই-ও তাঁকে চালিয়ে যেতে হবে। শিল্পী হিসেবে এই দায় আমি আজ সমধিক বলেই বিশ্বাস করি।"[৮৫]

তবে সব শিল্পীই যে 'জানের লড়াই' আর 'প্রাণের লড়াই'কে যুক্ত করার জন্য এক চোখে দেখার প্রবণতা ত্যাগ করেছিলেন তা নয়। অনেকে শুধুমাত্র দু-চোখ ভরে প্রাণের লড়াই করতে চেয়ে সংঘ বিরোধী পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।

গণনাট্য সংঘের ব্যক্তি বনাম গোষ্ঠীর লড়াইয়ে সম্ভবত সবথেকে বিতর্কিত নাম শম্ভু মিত্র। বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় রায় প্রমুখরা তাঁকে গণনাট্য সংঘে নিয়ে আসেন। তার আগে পর্যন্ত বিভিন্ন পেশাদার মঞ্চে নাট্যাভিনয়ের চেষ্টায় তাঁর শৈল্পিক চাহিদা পূরণ হয়নি। ১৯৪৩-এ ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের অধীনে গণনাট্য সংঘ নাট্যপ্রযোজনা শুরু করে। শম্ভু মিত্র সেখানে যুক্ত হন, একাধিক নাটকে অভিনয় করেন, 'নবান্ন' নাটকে যুগ্ম-পরিচালক ও অভিনেতা রূপে চূড়ান্ত সাফল্য পান। সর্বভারতীয় সম্পাদক অনিল ডি'সিলভা তাঁকে বাংলা কমিটির 'ড্রামা সেক্রেটারি'র পদও দেন। তবে তিনি নিজেকে কখনই স্পষ্ট করে 'বামপন্থী' দাবি করেননি। পরবর্তীকালে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "মতের দিক থেকে অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট তো ছিলামই।"[৮৬] পেশাদার মঞ্চ থেকে বন্ধুদের ডাকে আগত, নিজেকে সোচ্চারে 'বামপন্থী' না বলা এক শিল্পীর পক্ষে তখন গণনাট্যে স্বাধীনভাবে কাজ করায় রাজনৈতিকভাবে কোনো বাধা আসেনি। কারণ তখন ছিল পি সি যোশীর উদার সাংস্কৃতিক নীতি। উদয়শঙ্কর, রবিশঙ্কররা তখন গণনাট্যের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিলেন। সংঘের সর্বভারতীয় সভাপতিদের প্রথম দুজন ছিলেন অকমিউনিস্ট শ্রমিক নেতা নারায়ণ মালহার যোশী ও বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফ্যাসিবাদের বিপদ কেটে গেলে গণনাট্যকে আচমকা দেশীয় রাজনীতির মঞ্চে নেমে পড়তে হয়। দেশের উত্তপ্ত পরিসরে কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবাধীন সাংস্কৃতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় অনেকেরই রাজনৈতিক আপত্তি ছিল। অন্যদিকে সংঘের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির মুখটা ক্রমশ প্রকট হতে থাকে। ফ্যাসিবাদ বিরোধিতা ও সুন্দর সাংস্কৃতিক আন্দোলন নির্মাণের বদলে বামপন্থী মতাদর্শ গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়ায় জোর দেওয়া হতে থাকে। সেই পরিস্থিতিতে রবিশঙ্করের মনে হয়েছিল যে পার্টি অফিস থেকে নানারকম ফরমায়েস ক্রমে পার্টির হুকুমের রূপ নিচ্ছে। শিল্পের দিকে আগ্রহ কমে গিয়ে 'টপিক্যাল ইস্যু', যাতে সাংবাদিকতার ছোঁয়া থাকে, সে ধরণের শিল্পনির্মাণে জোর দেওয়া হতে থাকে।[৮৭] সুধী প্রধানের মতে শম্ভু মিত্রেরও পার্টির হয়ে রিলিফ কমিটির জন্য চাঁদা তোলার জন্য শিল্পনির্মাণে আপত্তি ছিল। তাঁর ধারণা ছিল সংগঠনের অর্থে তিনি প্রগতিশীল নাট্যপ্রযোজনা করবেন। এ বিষয়ে ক্ষোভ জানিয়ে তিনি পি সি যোশীকে চিঠিও লেখেন।[৮৮] ১৯৪৬ সালে গণনাট্যের মধ্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। কম সময়ের প্রস্তুতিতে যদি শিল্পগুণ নষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় শম্ভু মিত্র 'নবান্ন'-এর পুনঃপ্রযোজনা করতে চাননি। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ছাড়া তিনি 'নবান্ন' প্রযোজনা করতে রাজি ছিলেন না। ফলে 'নবান্ন' নিয়ে গ্রামে যাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা রইল না। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকটিকে তিনি অহেতুক কাটাছেঁড়া করেন। তিনি বেঁকে না বসলে জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান', বুলবুল চৌধুরীর ব্যালে প্রভৃতি প্রযোজনা গণনাট্যকে আরও সমৃদ্ধ করত। এমনকি বিজন ভট্টাচার্যের 'জিয়নকন্যা' অভিনয় করতেও তাঁর আপত্তি ছিল।[৮৯] সব মিলিয়ে শম্ভু মিত্রের সঙ্গে গণনাট্যের দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে।

১৯৪৬-এই গণনাট্যের গোয়াবাগান কমিউনে গুণ্ডারা আক্রমণ করে। শম্ভু মিত্র ওই ঘরেই থাকতেন, কিন্তু আক্রমণের সময়ে তিনি মুম্বইয়ে ছিলেন। স্বাধীনতার পর পুলিশি অত্যাচার, ধরপাকড়, নাটক বাজেয়াপ্ত করা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। সংঘের মধ্যেও সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ বজায় থাকেনি। পার্টি লাইনের প্রতি আনুগত্যই গণনাট্যের শিল্পী হয়ে ওঠার শেষ কথা ছিল। এই পরিস্থিতিতে শম্ভু মিত্র সংঘ ছেড়ে নিজস্ব নাট্যদল 'অশোক মজুমদার ও সম্প্রদায়' তৈরি করেন। যা পরে 'বহুরূপী' নামে জনপ্রিয় হয়।

কেন সংঘ ছেড়েছিলেন শম্ভু মিত্র? তাঁর কন্যা শাঁওলী মিত্রের যুক্তি ছিল গণনাট্যের অন্যতম প্রাণপুরুষ ও শম্ভু মিত্রের পিতৃসম 'মহর্ষি' মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যকে অপমান করায় তিনি দলত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আরও বলেছেন 'নবান্ন'-এর সাফল্যের ক্ষেত্রে শম্ভু মিত্রকে সংঘ থেকে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেওয়া হয়নি।[৯০] তবে এই দাবি শাঁওলী মিত্র ছাড়া আর কেউ করেননি। সংঘ ছাড়ার পরে শম্ভু মিত্র পারতপক্ষে গণনাট্যের নাম উচ্চারণ করেননি। নাম না করেও তিনি গণনাট্যের সংগঠক ও পার্টি নেতাদের শিল্পতত্ত্বের সংকীর্ণ ধারণা নিয়ে ক্রমাগত ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে গেছেন। যার মধ্যে তাঁর সংঘ ছাড়ার কারণ খুঁজে পাওয়া যায়। 'সন্মার্গ সপর্যা' গ্রন্থের 'নিবারণ পণ্ডিত' প্রবন্ধে তিনি বলছেন,

> "গণনাট্য সংঘে ঢুকে নতুন করে তখন আমায় বুঝতে হচ্ছে যে শিল্প কী, আঙ্গিকের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সম্পর্ক কী, শিল্পের আবেদনের লক্ষ্য কী, ইত্যাদি।"[৯১]

ময়মনসিংহে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন গণজীবনের সঙ্গে যথেষ্ট সম্পর্কিত নয় বলে এক পার্টি কর্মী রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষা বদলে দিয়েছিল। শম্ভু মিত্রের ভাষায় এ যেন 'আনতারা ফুসকলিয়ে গেল"।[৯২] পরে 'বটুকদা বিজন ও আমি' প্রবন্ধে তিনি জানান যে যাদের শিল্পকলা সম্পর্কে ন্যূনতম বোধ নেই অথচ মার্কসীয় শিল্পতত্ত্বের কিছু বকুনি জানা আছে, তাদের সঙ্গে তিনি আলোচনা করতেন না। তাঁর মতে ওই সময়ে গণনাট্যে ভাবের আদানপ্রদান হত না।[৯৩] স্পষ্টতই আক্রমণের লক্ষ্য গণনাট্যের পার্টি-সংগঠকদের দিকে। সাতের দশকের একাধিক প্রবন্ধে তিনি শিল্পের নামে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রচার করার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন তুলছেন। সেখানে তিনি গণনাট্য ছেড়ে 'রাজনৈতিক দলের ভেঁপুদার' না হয়ে 'বুদ্ধিচালিত রুচিসম্মত' নাট্যপ্রযোজনা করতে চেয়েছিলেন।[৯৪] তবে গোষ্ঠী-ব্যক্তির দ্বন্দ্বে আমরা শম্ভু মিত্রের প্রখর ব্যক্তিত্বপূর্ণ আত্মচিন্তার দর্শনকে এড়িয়ে যেতে পারি না। যার সামনে অনেক প্রতিভাসম্পন্ন নাট্যব্যক্তিত্বকেও মধ্যদুপুরে প্রবল সূর্যের আলোয় নক্ষত্রদের মতো হারিয়ে যেতে হয়। ফলে তিনিও হয়ে যান সূর্যের মতো একা। নৃপেন্দ্র সাহার ধারণা সেই কারণে তাঁর নিজের হাতে তৈরি 'বহুরূপী'-তেও তিনি শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেননি।[৯৫]

বিজন ভট্টাচার্য ১৯৪৮ সালে গণনাট্য ছেড়ে কিছুদিন বোম্বাইতে চলচ্চিত্রের কাজ করেন। ১৯৫০-এ তাঁর নিজস্ব নাট্যদল 'ক্যালকাটা থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন। সংঘ ত্যাগ করলেও গণনাট্যের আদর্শ তিনি কখনই ত্যাগ করেননি। পরবর্তী জীবনের নাট্যপ্রচেষ্টায় তাঁর নিজস্ব গণনাট্যের ধরণকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে গেছেন। গণনাট্য সংঘে আর ফিরে না এলেও কিন্তু তিনি শম্ভু মিত্রের মতো গণনাট্যের বিরোধিতা করেননি। বরং 'নয়ানপুর', 'বাস্তুভিটা', 'দলিল', 'রাহুমুক্ত' প্রভৃতি নাটকের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। রাজনৈতিক বিশ্বাসের সঙ্গে তিনি কখনও আপস করেননি। স্বীকার করে নিয়েছিলেন,

> "কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংশ্রবে না এলে, কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য না হলে, আমি বিজন ভট্টাচার্য হতাম না, আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তা করাও সম্ভব হত না।"[৯৬]

ফলে গণনাট্য সংঘের পক্ষাবলম্বী শিল্পী-সমালোচকরা যে যুক্তিতে দলত্যাগী শম্ভু মিত্রের দৃষ্টিভঙ্গিকে আক্রমণ করেছেন, বিজন ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে সে যুক্তি খাটে না। গোষ্ঠী ও ব্যক্তির দ্বন্দ্বের নিরিখেও তাঁকে ফেলা যাবে না। ১৯৪৬-এ সংঘের মধ্যে শৈল্পিক মতাদর্শ ও পার্টির হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করা ছাড়া তাঁর সংঘত্যাগের আর কোনো যথার্থ কারণও জানা যায় না। স্বাধীনতার পর নোয়াখালি দাঙ্গার সময়ে তিনি গান্ধীজির সঙ্গে গণনাট্যের দল নিয়ে সফরে যেতে চেয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী কাজ করে নাট্য-আন্দোলনকে মর্যাদা দেওয়া ছাড়া তাঁর আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু এই 'অবান্তর' প্রস্তাব আনার জন্য তাঁকে সর্বসম্মুখে অপদস্ত করা হয়।[৯৭]

গণনাট্য সংঘের পক্ষ থেকে রাজনীতিবিদ সুলভ 'একচোখামি'-র পর পরই তিনি সংঘ ছাড়েন। শুধু অপদস্থ হওয়া নয়, দু-পক্ষের নাট্যধারণার মধ্যেও বিস্তর তফাৎ তৈরি হচ্ছিল। রণদিভে নীতির সময় থেকে গণনাট্য সংঘের নাটকে শিল্পগুণের বদলে প্রচারে অধিক গুরুত্ব দেওয়া হতে থাকে। সরাসরি পার্টির ছাপ না থাকলে গণনাট্য বলে স্বীকৃতি পেত না। এই পরিস্থিতি গ্রামীণ লোকজীবনের উপাদানে সিক্ত বিজন ভট্টাচার্যের মানবদরদী আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে মার্কসবাদের উদারনৈতিক মিশ্রণ যে বাতিল হবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তিনি বিশ্বাস করতেন 'ধান' procurement-

এর আগে 'প্রাণ' procurement প্রয়োজন। যা কংগ্রেস পারেনি, পরে যুক্তফ্রন্ট সরকারও করেনি।[৯৮] গান্ধীজির আগস্ট আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থন ছিল, 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে তার ছবিও তিনি এঁকেছিলেন। অথচ পার্টি তথা গণনাট্যের কাছে আগস্ট আন্দোলন ছিল 'পঞ্চম বাহিনী'র তৈরি করা জাতীয় সংকট।[৯৯] যে মাকে তিনি সনকারূপে আগস্ট আন্দোলনে দেখেছিলেন, সেই মাকেই তিনি দেখেন দাঙ্গার সময় ছিন্নমস্তা রূপে। আবার তাঁকেই তিনি দেখেন শিয়ালদহ স্টেশনে বাস্তুহারার মিছিলে, কাকদ্বীপে, তেলেঙ্গানায় দেখলেন অহল্যারূপে। সেই মায়ের জন্য আগুন জ্বালিয়ে রাখার সততা ছিল না তাঁদের, শুধু দুয়েকটা আশ্বাসের কথা বলে উধাও হয়ে গিয়েছিলেন।[১০০] গণনাট্য যে এই মায়ের দুঃখ বেদনার চারণকবি হয়ে উঠতে চেয়েছিল, এ কথা অনস্বীকার্য। কিন্তু ব্যর্থতার কঠোর সত্যকে স্বীকার করে নেওয়ার সাহস সবার ছিল না। গণনাট্য সংঘের ছাঁচে বাঁধা তাত্ত্বিক কাঠামোয় দাঁড়িয়ে বৃহৎ পরিসরব্যাপী এই দর্শনকে রূপ দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই তিনি হয়ে গেলেন 'বিজন পথের পথিক'।

চারের দশকের শেষে শুধু শম্ভু মিত্র বা বিজন ভট্টাচার্য নন, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, তৃপ্তি মিত্র, মহম্মদ ইসরাইল সংঘত্যাগ করেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উদয়শঙ্কর, রবিশঙ্করদের সঙ্গে সংঘের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। যে সজল রায়চৌধুরী মৃত্যুঞ্জয় অধিকারী ছদ্মনামে 'লোকনাট্য' পত্রিকায় দলত্যাগীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছিলেন, পরবর্তীকালে তিনিই বলেছেন, "চল্লিশ দশকের প্রতিভান্বিত শিল্পীরা অনেকেই নিঃশব্দে গণনাট্য ছেড়ে গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন জানি তবু বলব না।"[১০১] পাঁচের দশকেও সংঘ থেকে নাট্যব্যক্তিত্বদের অপসারণ অব্যাহত থাকে। ১৯৫২-তে উৎপল দত্ত, শোভা সেন, ১৯৫৩-তে সলিল চৌধুরী, ১৯৫৪-তে ঋত্বিক ঘটক, কালী ব্যানার্জি, তারপরে দেবব্রত বিশ্বাস, নিবেদিতা দাস, বীরু মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, মমতাজ আহমেদ প্রমুখরা সংঘ ছাড়েন। কাউকে বহিষ্কার করা হয়, কেউ স্বেচ্ছায় সরে আসেন। সুধী প্রধানের বিশ্লেষণ ছিল,

> "উৎপলবাবু কথাবার্তায় উগ্র—কাজেই তিনি বেশিদিন টিকতে পারলেন না—আর গণনাট্যে তখন যোশী-রণদিভে লাইনের দ্বন্দ্ব পুরাদমে বিদ্যমান; তাই উৎপলবাবুর নামে ট্রটস্কিপন্থী

বদনামও যুক্ত হয়েছিল।... ঋত্বিক আর কালী ব্যানার্জির নাটুকে দল গড়ার উৎসাহ না থাকতে তাঁরা ফিল্মে চলে গিয়ে নিজেদের ব্যবস্থা করে নিলেন।"[১০২]

উৎপল দত্ত ও ঋত্বিক ঘটককে কীসের ভিত্তিতে 'ট্রটস্কিপন্থী' বলা হয়েছিল, তার ব্যাখ্যা গণনাট্যের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি। পার্টি আইনি হওয়া ও রণদিভে নীতি বাতিল হওয়ার পর সবকিছুকেই অতি-সাবধানী চোখে দেখার প্রবণতা থেকেই এই শব্দগুলির উৎপত্তি। রণদিভে যুগে যেমন 'সংশোধনবাদ'কে ঢাল করা হত, তেমনই এই সময়ে 'ট্রটস্কিবাদ'কে ব্যবহার করা হয়। ধনঞ্জয় দাশ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন 'টিটোপন্থী-ট্রটস্কিপন্থী' এই শব্দবন্ধগুলিকে আদৌ নিহিতার্থ বুঝে ব্যবহার করা হত কিনা![১০৩]

উৎপল দত্ত পরবর্তীকালে গণনাট্য আন্দোলনকে নিজস্ব রূপ দিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে গণনাট্য সংঘ ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্পর্কে নানা চড়াই-উতরাই থাকলেও একেবারে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়নি। তার মূল কারণ উৎপল দত্তের বিরাট নাট্যপ্রতিভা ও প্রবল জনপ্রিয়তা উপেক্ষা করার ক্ষমতা পার্টি বা সংঘ কারোর ছিল না।। ১৯৫৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে ঋত্বিক ঘটককে গণনাট্য সংঘ ও কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মদ্যপান, প্রতারণা, নৈতিক চরিত্রের অবনতি, ধর্মঘট ভাঙা, ট্রটস্কিপন্থা অবলম্বনসহ মোট তেইশটি অভিযোগ ছিল।[১০৪] ঋত্বিক কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য সম্পাদককে দীর্ঘ চিঠি লিখে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা প্রত্যেকটি অভিযোগ খণ্ডন করেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি মূল দুই অভিযোগকারী গণনাট্যের সর্বভারতীয় সম্পাদক নিরঞ্জন সেন ও নির্মল ঘোষের 'দলবাজি' ও 'বিভেদ সৃষ্টি'র প্রবণতাকে বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দায়ী করেন। তাঁর মতে নিরঞ্জন সেনের সংগঠনকে 'পকেট'-এর মধ্যে রাখার কৌশলের জন্য উৎপল দত্ত, সলিল চৌধুরী ও দেবব্রত বিশ্বাসের মতো তাঁকেও বিতাড়িত করা হচ্ছে। এই ধরণের বিষয়গুলিতে পার্টি কেন দৃকপাত করে না, সে বিষয়েও তিনি যথেষ্ট অবাক হয়েছিলেন। অবশ্য তিনি জানতেন যে পার্টি আইপিটিএ-র এই ব্যাপারগুলো সম্পর্কে উদাসীন, তাই নিরঞ্জন সেন প্রমুখরা স্বেচ্ছাচারী সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।[১০৫]

ব্যক্তিগত অভিযোগের বাইরে সাংস্কৃতিক দিকটিও ঋত্বিকের সঙ্গে গণনাট্যের দ্বন্দ্বে প্রভাব ফেলেছিল। ১৯৫১ সালে ঋত্বিক ঘটক গণনাট্যের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ নিয়ে একটি দলিল রচনা করেন। যেটি বাতিল হয়ে যায়। সুনীল দত্ত মনে করেছিলেন ঋত্বিকের খসড়াটি পাস হয়ে গেলে গণনাট্যের নেতাদের ক্ষমতা খর্ব হয়ে যেত। তাই সিপিআই-এর নেতাদের সাহায্য নিয়ে তাঁর খসড়াটি বাতিল করে দেওয়া হয়।[১০৬] একই আশঙ্কা ঋত্বিক ঘটকও করেছিলেন,

> "শিল্পের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গির প্রশ্নে আইপিটিএ-র বোম্বাই কনফারেন্সে আদর্শগতভাবে তাঁদের জয় হওয়ায় তাঁরা চুপচাপ ছিলেন।... সুতরাং তাঁরা সেই গোপনে এবং ভেতরে ভেতরে চাপা প্রচারের পুরনো পদ্ধতিটাই নিলেন।"[১০৭]

খসড়াটি বাতিল হওয়ার পর ঋত্বিক 'অন দ্য কালচারাল ফ্রন্ট' নামে একটি দলিল লেখেন। সেখানে তিনি আগামী গণসংস্কৃতি আন্দোলনের রূপ, উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেন। এই দলিলে তিনি গণনাট্যের সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক গতিপ্রকৃতির বেশ কিছু দুর্বলতা তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য ছিল গণনাট্যের কমিউনিস্ট শিল্পীরা হুড়োহুড়ি করছে, গুঁতোগুঁতি করছে, কিন্তু আদতে এক জায়গাতেই বসে আছে; এগোচ্ছে না। 'টাকা আয়ের যন্ত্র' হিসেবে দেখা ছাড়া পার্টিরও সংঘের সাংস্কৃতিক শক্তি ব্যবহার করা আর নিয়ে কোনো উৎসাহ নেই। গণনাট্য নিয়ে জনতার কাছে পৌঁছোতে হলে গান্ধীজির মতো জননেতার আদর্শ নিয়ে চর্চা করতে হবে। প্রয়োজনে বুর্জোয়াদের থেকে প্রযোজনার কায়দা শিখতে হবে। লোকনাট্য ও লোকশিল্পীদের উঠে আসার রাস্তা তৈরি করতে হবে। তার বদলে শিল্পীদের খাচায় পুড়ে তর্জন-গর্জন করে লাভ নেই।[১০৮] এবং তিনি কঠোরভাবে 'শিল্প-সংগঠক' এই ধারণার বিরোধী ছিলেন। তাঁর মত ছিল,

> "শিল্পী নন এমন শিল্প-সংগঠকদের ওপর একাজের দায়িত্ব দেওয়া আর এস্কিমোদের শিকার-সংগীত দিয়ে হটেনটটদের বিপ্লবী কাজে উদ্বুদ্ধ করা একই ব্যাপার। এটা গণসংগঠন নয়, এর সমস্যার চরিত্রও তাই সাধারণ নয়।"[১০৯]

ঋত্বিকের বক্তব্য যে অনেক 'শিল্প-সংগঠক'-এর কাছেই অস্বস্তিকর শোনাবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। যদিও পরবর্তীকালে নির্মল ঘোষ জানিয়েছিলেন যে ঋত্বিক যেমন পার্টিকে পরোয়া করেনি, কমিউনিস্ট পার্টিও কোনোদিন ঋত্বিককে পরোয়া করেনি। আর ঋত্বিক কখনও কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিল না।[১১০] কিন্তু গণনাট্যের আরেক নাট্যকার উমানাথ ভট্টাচার্য মনে করতেন ঋত্বিক, উৎপল দত্ত, মমতাজ আহমেদ, কালী ব্যানার্জির মতো প্রতিভাশালী নাট্যকার-পরিচালক-অভিনেতাদের সরিয়ে গণনাট্যের নেতারা সম্ভবত নিজেদের পথ নিষ্কণ্টক করেছিলেন।[১১১] ফলে সুধী প্রধানের মতে ফিল্মে যাওয়ার জন্য ঋত্বিক সংঘ ছেড়েছিলেন এরূপ মন্তব্য সমগ্র পরিস্থিতির একপাক্ষিক অতিসরলীকরণ। সলিল চৌধুরী মুম্বইয়ে গিয়ে চলচ্চিত্র জগতে সংগীত পরিচালকের কাজে যুক্ত হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে 'কেরিয়ারিস্ট' অভিযোগ আরও জোরদার হয়। দেবব্রত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি ধর্মঘট ভেঙেছিলেন। অথচ গণসংগ্রামের দিকে ঠেলে দিয়ে প্রীতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিল্পীকে 'খতম' করার পর রেকর্ড কোম্পানি তাঁকে অচ্ছুৎ করে রেখেছিল। তখন একমাত্র দেবব্রত বিশ্বাসই ওই কোম্পানির হয়ে রেকর্ড না করার সিদ্ধান্ত নেন। সেদিন সংঘ বা পার্টি কেউই দায়িত্ব নেয়নি।[১১২]

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় গণনাট্য সংঘে আসেন পাঁচের দশকের মাঝামঝি সময়ে। সংঘের কলকাতা কেন্দ্রিক শাখাগুলিকে একত্রিত করে একাধিক গণনাট্য উৎসব আয়োজন করার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। গণনাট্য সংঘের মধ্যে পার্টির নির্বাচনভিত্তিক হস্তক্ষেপ নিয়ে তাঁর সঙ্গে সংগঠকদের মতবিরোধ তৈরি হয়। সারাবছর মানুষের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন রাজনৈতিক নাট্যচর্চা করে নির্বাচনের সময়ে পথনাটিকা করে সুনাম অর্জন করায় তাঁর আপত্তি ছিল। নির্বাচনে জেতার জন্য গণনাট্যের শিল্পীদের পথনাটিকা বা পোস্টার প্লে-তে হাস্যকরভাবে ব্যবহারের প্রতিবাদ করায় তাঁকে পার্টি নেতৃত্ব 'বিশ্বাসঘাতক' তকমা দেয়।[১১৩] একই সঙ্গে গণনাট্যের কাজেও তিনি বেশ কিছু সুবিধাবাদী সীমাবদ্ধতা লক্ষ্য করেছিলেন।[১১৪] ১৯৬১ সাল থেকে তিনি গণনাট্য সংঘের 'নান্দীকার' শাখাটিকে স্বতন্ত্রভাবে পরিচালনা করা শুরু করেন।

ছয়ের দশকের মাঝামাঝি সময়ে পার্টি ও সংঘের ভাঙনের প্রেক্ষিতে অনেকের সঙ্গেই গণনাট্যের দূরত্ব তৈরি হয়। মতান্তরকে মনান্তরে পরিণত না করতে চেয়ে সজল রায়চৌধুরী সংঘ

থেকে 'ছুটি' নিয়েছিলেন। ভারত-চিন সীমান্ত সংঘর্ষের প্রেক্ষিতে 'সীমান্তের ডাক' নাটক লেখায় দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অচ্ছুৎ করে দেওয়া হয়। উৎপল দত্ত, হেমাঙ্গ বিশ্বাস প্রমুখরা গণনাট্যের বৃহত্তর আন্দোলন সৃষ্টির ক্ষমতায় আস্থা হারিয়ে 'গণশিল্পী সংস্থা' গঠন করেন।

সাধারণত দেখা গেছে যে-সকল প্রথিতযশা শিল্পী গণনাট্য ছাড়তে চেয়েছেন, তাঁদেরকে 'কেরিয়ারিস্টিক', 'আত্মম্ভরী', 'সুবিধাবাদী' বলে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। সুধী প্রধানের মতে আদর্শগত কারণে গণনাট্য ভেঙে 'বহুরূপী' তৈরি হয়নি, বরং শম্ভু মিত্র ব্যক্তিগত উচ্চাশা পূরণ ও খ্যাতিলাভের জন্য দল ছাড়েন।[১১৫] বিজন ভট্টাচার্যও সংঘ ছাড়ার পর কিছুদিন ফিল্মের কাজে যুক্ত ছিলেন। একই যুক্তি খাটে ঋত্বিক ঘটক ও সলিল চৌধুরীর ক্ষেত্রে। এঁদের সঙ্গে সংঘের দ্বন্দ্বের কারণ আমরা আলোচনা করেছি। কিন্তু আরও অনেকেই ছিলেন যাঁরা তথাকথিত খ্যাতি-প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘত্যাগ করেননি। মহম্মদ ইসরাইল দেশভাগের পর পূর্ববঙ্গের নিরাপদ জীবিকা ছেড়ে এদেশে গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তিনি পরে 'বহুরূপী'-র সঙ্গে যুক্ত হন। গণনাট্যের প্রতীক 'কল অফ দ্য ড্রাম'-এর শিল্পী চিত্তপ্রসাদ ভট্টাচার্যের সঙ্গেও সংঘের সম্পর্ক ছিন্ন হয়। বাংলা পথনাটকের রূপকার পানু পাল পরবর্তীকালে সিপিআই-এর সাংস্কৃতিক সংগঠন আইপিসিএ-র সঙ্গে যুক্ত হন। চিত্তপ্রসাদ বা পানু পাল দুজনেই তাঁদের যোগ্যতামান অনুযায়ী 'খ্যাতি-প্রতিষ্ঠা' পাননি। এমনকি বিজন ভট্টাচার্যকেও আজীবন দারিদ্র্যের সঙ্গে ঘর করে যেতে হয়েছে। সংবাদপত্রের স্বরূপ উন্মোচন করে নাটক লেখার অপরাধে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উনিশ বছরের চাকরিজীবনে ইতি হয়ে যায়। অথচ সীমান্ত সমস্যায় সংঘের বিরুদ্ধ মত নিয়ে নাটক লেখার জন্য আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে তাঁকে সংঘ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

থিয়েটার মহলে একটি প্রচলিত বাক্যবন্ধ হচ্ছে 'ব্যক্তির চেয়ে গোষ্ঠী বড়ো'। স্বাধীনতা পূর্ববর্তী থিয়েটারের অভিনয়গত ও সাংগঠনিক একক কর্তৃত্বকে সরিয়ে গণনাট্য সংঘই বাংলা থিয়েটারে গোষ্ঠীচেতনা নিয়ে এসেছিল। সেই ধারণাই পরে গ্রুপ থিয়েটারে সঞ্চারিত হয়। কিন্তু অনেক ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই গোষ্ঠী তৈরি হয়। ফলত গোষ্ঠী আসলে ভিন্ন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অসংখ্য মানুষের সমাহার—যারা একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে একত্রিত হয়েছে। গণনাট্যের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে সেই

উদ্দেশ্য ছিল বামপন্থী রাজনৈতিক বিশ্বাসে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল করা এবং প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলন নির্মাণ করা। পরবর্তীকালে সকলকে একই ছকে বেঁধে ফেলার প্রবণতা শুরু হয়ে যায়। আবার এক বা একাধিক ব্যক্তিই সংঘের সংবিধান প্রয়োগের সাংগঠনিক বিন্যাসের দায়িত্বে থাকেন। সাফল্য-ব্যর্থতার খতিয়ান, একক প্রচার, সর্বময় কর্তৃত্বের সম্ভাবনা প্রভৃতি সমস্যা তো ছিলই, তার সঙ্গে শিল্প ও রাজনীতির বহুমুখী আদর্শকে একটি ধাঁচে আবদ্ধ করতে গিয়ে সমস্যা আরও বৃদ্ধি পায়। এই দ্বন্দ্বের সমাধান নির্ভর করে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্কের রসায়ন ও উভয়ের নমনীয়তার উপর। গণনাট্যের ক্ষেত্রে কুৎসা, দোষারোপ, দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বিবাদ বাড়িয়েই তোলা হয়েছে, রক্তক্ষরণ বন্ধ করা যায়নি।

গণনাট্য বনাম নবনাট্য :

'নবনাট্য আন্দোলন' কবে থেকে শুরু হয়েছিল? অধিকাংশ পণ্ডিতই এই বিষয়ে একমত নন। ১৯৪৮ সালে গণনাট্য সংঘ থেকে শম্ভু মিত্রের বেরিয়ে আসা এবং নতুন ধরণের নাট্য-প্রযোজনার প্রচেষ্টাকে অনেকে 'গণনাট্য বনাম নবনাট্য'-এর সঙ্গে এক করে দেখেছেন। ১৯৫৬ সালে শম্ভু মিত্র 'সমস্যার একটি দিক' প্রবন্ধে মন্তব্য করেন, "আজ প্রায় দশ-বারো বৎসর ধরে নবনাট্য আন্দোলন শুরু হয়েছে।"[১১৬] তিনি গণনাট্য সংঘের সূচনার সময়কাল অর্থাৎ ১৯৪৩ সাল থেকে নবনাট্য আন্দোলনের সূচনা বলে মনে করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে দেখলে গণনাট্য সংঘ বাংলা নাটকে নতুন চিন্তা-চেতনা ও নাট্যপদ্ধতি নিয়ে এসেছিল। সে অর্থে গণনাট্যের নাট্যপ্রচেষ্টাকে নবনাট্য আন্দোলন বলে উল্লেখ করায় কোনো ভুল নেই। গণনাট্যের অনেক শিল্পীই গণনাট্যসহ বৃহত্তর নাট্য-আন্দোলনকে নবনাট্য বলে উল্লেখ করেছিলেন। আসলে 'নবনাট্য' শব্দটির ধারণা এত বিস্তৃত ও বহুমুখী যে তার মধ্যে অনেক বৈশিষ্ট্য একই সঙ্গে থাকতে পারে।

কিন্তু শম্ভু মিত্র গণনাট্যের অস্তিত্বকে প্রায় মুছে দিয়ে 'নবনাট্য'-এর ধারণা চালু করতে চেয়েছিলেন। গণনাট্য সংঘে শম্ভু মিত্রের ইতিহাস আমরা জানি। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে সম্পূর্ণ

নিজের সামর্থ্যে একটি স্বতন্ত্র ধারার নাট্য-আন্দোলন সৃষ্টি করা নেহাত মুখের কথা ছিল না। তাই তিনি নিজস্ব মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য গণনাট্যকে সম্পূর্ণ অস্বীকার ও নবনাট্যের সূচনাকাল নিয়ে একটা সচেতন ধোঁয়াশা সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন, এরকম ধারণা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

কিন্তু ওই প্রবন্ধের আগে-পরে 'গণনাট্য বনাম নবনাট্য' ধারণা উৎপত্তি হয়নি। ১৯৬০ সালে বহুরূপী পত্রিকায় 'নবনাট্য'-এর সংজ্ঞা দেওয়া হয়,

> "সৎমানুষের নতুন জীবনবোধের এবং নতুন সমাজ ও বলিষ্ঠ সমাজ গঠনের মহৎ প্রয়াস যে সুলিখিত নাটকে শিল্পসুষমায় প্রতিফলিত তাঁকেই বলতে পারি নবনাট্যের নাটক।"[১১৭]

স্পষ্টতই সংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট। 'নতুন জীবনবোধ', 'বলিষ্ঠ সমাজ গঠন'-এর সন্ধান গণনাট্য সংঘও করেছিল, রাজনৈতিক দিক থেকে দেখলে সৎ মানুষেরও অভাব ছিল না। শিল্পসুষমা নিয়ে অবশ্য প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সংজ্ঞার মধ্যে বিতর্কের আগুন ছিল না। অন্যদিকে ১৯৪৮ সালে পার্টির 'ঝুটা-স্বাধীনতা' রাজনীতির সময়ে শম্ভু মিত্র বেরিয়ে যাওয়ার পরেও দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নবনাট্য আন্দোলনের সংকট' প্রবন্ধে গণনাট্যসহ সামগ্রিক নাট্য-আন্দোলনের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন।[১১৮] সুধী প্রধান 'নাট্য আন্দোলনের পটভূমি' প্রবন্ধে 'নবনাট্য আন্দোলন'-এর মধ্যে 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' ছাড়াও তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান', 'ছেঁড়া তার' নাটকদুটিকে সংযুক্ত করেন।[১১৯] এই নাটকদুটি গণনাট্য সংঘ দ্বারা অভিনীত হয়নি। বরং ১৯৫০ সালে শম্ভু মিত্রের নির্দেশনায় 'বহুরূপী'র প্রযোজনায় 'ছেঁড়া তার' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। সুধী প্রধানের মতো কট্টর 'গণনাট্য' সমর্থক তাঁর 'নবনাট্য'-এর ধারণায় গণনাট্যের নাটক ছাড়াও শম্ভু মিত্র নির্দেশিত নাটককে স্থান দেন। অর্থাৎ শম্ভু মিত্র যে আলাদা কোনো নাট্য-আন্দোলন শুরু করেননি বা তাঁরাও যে গণনাট্যের দেখানো রাজনীতি সচেতন পথেই হেঁটেছিলেন, এ কথা সুধী প্রধান প্রমাণ করতে চান। লক্ষ্যণীয় তখনও 'গণনাট্য ও নবনাট্য'-এর দ্বন্দ্ব তৈরি হয়নি। ১৯৪৮ ও ১৯৬৪, গণনাট্য সংঘের

দুটি ভাঙনের কালে 'নবনাট্য আন্দোলন' শব্দটির মধ্যে গণনাট্যের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে সেই সময়ে কোনো বিতর্ক তৈরি হয়নি। এমনকি শম্ভু মিত্রও বলছেন,

> "নবান্নের পর এইসব তর্ক যেন তুমুলভাবে ঘনিয়ে ওঠে। প্রোপাগান্ডা বনাম বিশুদ্ধ শিল্পকলা। জনগণের হিতার্থে মাঠেময়দানে, না গজদন্ত মিনারে।–বিভেদের এত সহজ বিন্যাস কিন্তু জীবনে ছিল না। এগুলো শুধু তার্কিকদের সৃষ্টি।–এরকম আরও অনেক।"[১২০]

গণনাট্য বনাম নবনাট্য—এই বিতর্ক শুধু তার্কিকদের সৃষ্টি ছিল না। এর সঙ্গে জড়িয়েছিল বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংকটের ইতিহাস। ১৯৬২ সালের নির্বাচনের আগে শম্ভু মিত্র, উদয়শঙ্কর, মনোজ বসু প্রমুখরা বসিরহাটের কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন কবির আয়োজিত একটি জনসভায় অংশগ্রহণ করেন। শম্ভু মিত্র সেখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করেন। শম্ভু মিত্র, উদয়শঙ্করদের সঙ্গে গণনাট্যের দূরত্ব দীর্ঘদিনের, 'বহুরূপী'র সংগীত-নাটক আকাদেমির আর্থিক সাহায্য পাওয়ার ফলে বাংলার গণনাট্য শিল্পীরা শম্ভু মিত্রের রাজনৈতিক অবস্থানকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। শম্ভু মিত্রের 'নির্বাচনী প্রচারসভা'য় অংশগ্রহণকে ব্যঙ্গ করে গোপাল হালদার 'পরিচয়' পত্রিকায় 'ক্যাজুয়েলটি' শিরোনামে একটি লেখা লেখেন। যেখানে শম্ভু মিত্রের রাজনৈতিক অবস্থান, 'বহুরূপী'র প্রযোজনাকে ব্যঙ্গ করা হয়।[১২১] প্রত্যুত্তরে শম্ভু মিত্রও গোপাল হালদারকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেন। বাম-সাংস্কৃতিক মহলের শরিক হলেই তিনি 'প্রগতিশীল' আর অন্য রাজনৈতিক মতাবলম্বী হলেই তিনি 'প্রতিক্রিয়াশীল'—এই সরল সমীকরণের তিনি বিরোধিতা করেন। নির্বাচনে সিপিআই-এর পরাজয় ও তারপরেই ভাঙনের ফলে আপাতত বিতর্কটি ধামাচাপা পড়ে যায়।

১৯৬৩-৬৪ সালে গণনাট্যের পুনর্গঠন, গণশিল্পী সংস্থার প্রতিষ্ঠা এবং নতুন করে গণনাট্য আন্দোলনকে গড়ে তোলার তাগিদে পুনরায় বিতর্কটি মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। গণনাট্য সংঘের নাট্যপত্রিকা 'গণনাট্য'-এর প্রথম সংখ্যায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও শেখর চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে নবনাট্যের যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। বামমনস্ক অনেক বুদ্ধিজীবীই শম্ভু মিত্রের নাট্যপ্রযোজনার ধরণ, তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ ব্যতিরেকে শিল্পকর্মের আদর্শকে আক্রমণ করেন। ততদিনে বহুরূপীর

মতো করে অন্যান্য অনেক নাট্যদলই গণনাট্যের বৃহত্তর নাট্য-আন্দোলন থেকে সরে এসেছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁরাও এই বিতর্কের মধ্যে ঢুকে পড়ে। শম্ভু মিত্র গণনাট্য ছাড়ার পর থেকে দুটি স্বতন্ত্র ধারার নাট্য-আন্দোলন পাশাপাশি চলছিল, মতপার্থক্যও ছিল। কিন্তু এই সময় থেকেই নবনাট্য আন্দোলনকে বৃহত্তর গণনাট্য আন্দোলনের প্রতিস্পর্ধী রূপে দেখা শুরু হয়। প্রকৃত অর্থে গণনাট্য 'বনাম' নবনাট্যের সূচনা হয়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে 'গণনাট্য বনাম নবনাট্য' এই নিয়ে সমস্ত আলোচনা-বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে ১৯৬৪ সালের পর। সেই সময় থেকেই বহুরূপীসহ নবনাট্য আন্দোলনের শরিক নাট্যদলগুলির প্রযোজনার বৈশিষ্ট্যগুলিকে একত্রিত করে 'নবনাট্য'-এর ধারণাকে সুসংবদ্ধ করা হয়।

শম্ভু মিত্র 'নবনাট্য'-এর কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে যাননি। বহুরূপীর পরিচালন পদ্ধতি, তাদের নাট্যপ্রযোজনার বৈশিষ্ট্য, তার পদাঙ্কণ অনুসারী অনেক নাট্যদলের সৃষ্টি এবং গণনাট্য সংঘ থেকে বেরিয়ে আসা কিছু শিল্পীর নিজস্ব নাট্যধারার সন্ধান 'নবনাট্য'-এর ধারণা তৈরি করেছিল। ১৯৬৩-৬৪ সালে শম্ভু মিত্র 'একটি আলোচনা' প্রবন্ধে লেখেন যে 'উত্তপ্ত' পরিস্থিতিতে 'নবনাট্য', 'সৎনাট্য', 'প্রগতিবাদী নাট্য' শব্দগুলির যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে তার মানে হারিয়ে যেতে বসেছে।[১২২] অর্থাৎ 'গণনাট্য বনাম নবনাট্য' এই ধারণার মধ্যে তিনি বিব্রত বোধ করেছিলেন। ছয়ের দশকের শেষের দিকে 'একত্র অথচ স্বাধীন হওয়ার সভ্যতা' প্রবন্ধে শম্ভু মিত্র নবনাট্যের আদর্শকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন। তাঁর মতে তিনি ও তাঁর দল এমন একটা নাট্য-আন্দোলন শুরু করতে চেয়েছিলেন,

> "সেটা যেমন ব্যবসাদার হবে না, তেমনি কোনো রাজনৈতিক দলের ভেঁপুদার হবে না। তেমনি আবার জীবনবিমুখ বিশুদ্ধ শিল্পের ভড়ংও করবে না। সেটা সকল অর্থে সামাজিক হবে। গভীরভাবে সামাজিক দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন।"[১২৩]

'রাজনৈতিক দলের ভেঁপুদার' বলতে যে তিনি গণনাট্য সংঘ তথা সম-রাজনৈতিক দায়িত্বপালনকারী দলগুলির কথা বলতে চেয়েছেন এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রাথমিকভাবে ‘গণ’ ও ‘নব’-এর মধ্যে আদর্শগত ফারাক এত বিতর্কিত ছিল না। ‘নব’-এর শিল্পীরাও রাজনীতি সচেতন ছিল, অনেকক্ষেত্রে তাঁরা বাম-রাজনীতির ঊর্ধ্বে বৃহত্তর মানবতার সন্ধান করেছিলেন। তবে কোনো রকম রাজনৈতিক তাৎপর্যেরই সরাসরি বিরোধিতা করেননি। বৃহত্তর মানবতার আদর্শের খোঁজ গণনাট্যও করেছিল, কিন্তু একটি বিশেষ রাজনৈতিক আদর্শকে সামনে রেখে। গণনাট্যের সঙ্গে পার্টির অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক ছিল। ফলে রাজনৈতিক দিক থেকেও গণনাট্য সবার জন্য ছিল না। তুলনায় নবনাট্যের দ্বার সবার জন্য উন্মুক্ত। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে ‘প্রগতিশীল’ হওয়ারও দায় ছিল না। তবে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পালন করার জন্য গণনাট্য তাকিয়েছিল মানুষের বাহ্যিক অভিঘাতের দিকে। নবনাট্য আধুনিক মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, সমাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক, তার অন্তরের রক্তক্ষরণের দিনলিপি লিখতে চেয়েছিল। গণনাট্য সরল সমাধানের দিকে তাকিয়েছিল, নবনাট্য ছেড়ে দিয়েছিল মানুষের রুচির ওপরে। তা বলে নবনাট্য মানে শুধুই শিল্পের জন্য শিল্প নয়। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্রেশটের অনুবাদে, মনোজ মিত্র-বিভাস চক্রবর্তীর লোকশিল্পের অনুষঙ্গে প্রত্যক্ষ রাজনীতির আঁচ পাওয়া যায়। অবশ্য তাতে গণনাট্যপন্থীদের মতো সর্বহারার রাজনৈতিক স্লোগান ছিল না। কারণ নবনাট্যের মূল দর্শক ছিল শহুরে শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবী জনতা, বড়ো জোর মফস্বল অঞ্চলে কল-শোর দর্শক। যার রুচিনির্মাণের দায়িত্ব নবনাট্যকে নিতে হয়নি। অন্যদিকে গণনাট্যের প্রযোজনার মূল লক্ষ্য ছিল শ্রমিক-কৃষকের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটানো। গণনাট্য কিছু ক্ষেত্রে তাঁদের রুচিনির্মাণের দায়বহন করেছিল, কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রচারের মধ্যেই তলিয়ে গিয়েছিল।

তবে গণনাট্য মানেই প্রচারমূলক বিষয় আর নবনাট্য মানেই শিল্পসুষমার জয়ধ্বজা ওড়ানো—বিষয়টা এত সরল নয়। পরীক্ষামূলক নাট্যপ্রযোজনার চেষ্টা গণনাট্যও করেছিল, কিন্তু সংঘ নেতৃত্বের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপূরণে পার্টির নজরদারি এবং প্রতিকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে সংঘের একাধিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। গণনাট্যই পোস্টার নাটক ও পথনাটককে রাজনৈতিক ভাববহনের সক্ষম করে তোলে। সচেতন শিল্পীর অভাব ও একের পর এক গুণী শিল্পীর দলত্যাগের ফলে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্পৃহা নষ্ট হয়ে যায়। সম্মেলনে বারবার উল্লেখ করা সত্ত্বেও লোকশিল্পকে

ব্যবহার করার কোনো স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ গণনাট্যের ক্ষেত্রে চোখে পড়ে না। লোকশিল্প-লোকসংস্কৃতি ব্যবহারের ব্যর্থতা, আঙ্গিকগত দীনতা, প্রযোজনার স্থূলতা—গণনাট্যের এই দুর্বল স্থানগুলি দিয়ে নবনাট্য তার শক্তি বাড়িয়ে নেয়। নবনাট্যের মঞ্চে রবীন্দ্রনাথকে সার্থকভাবে আবিষ্কার করা গেছে এ-কথাতেও অত্যুক্তি নেই। নাট্যআঙ্গিকে লোকজ শিল্পগুলির ব্যবহার বক্তব্যকে কত শক্তিশালী করে তুলতে পারে, তার একাধিক উদাহরণ দেখা গেছে। সুগভীর চিন্তা ও পরিশ্রমে প্রাচীন ঐতিহ্য, দেশীয় লোকশিল্প, বিদেশি নাট্যকলার সার্থক মিশ্রণে বাংলা নাটক কীভাবে হৃদয় আর বুদ্ধিকে স্পর্শ করে আন্তর্জাতিক স্তরে উঠতে পারে নবনাট্য তা করে দেখিয়েছে। এইখানেই নবনাট্যের সব থেকে বড়ো সাফল্য।

কিন্তু এটাও বিবেচ্য যে নবনাট্য আন্দোলন কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ছায়ায় অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে স্বাধীনতা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিছু নাট্যদলের প্রযোজনায় ক্লাসিকের নামে 'ব্যাপিকা বিদায়' ও বিড়লার লেখা 'উমার তপস্যা' মঞ্চস্থ হয়। চরিত্রের আত্মানুসন্ধান ক্রমশ দুর্বোধ্য হতে থাকে। সম্পর্কের অনালোকিত দিক আবিষ্কারের চেষ্টা রুচিহীনতার জন্ম দেয়। গণনাট্যের বিরোধিতা করতে গিয়ে যে মানুষের জন্য নাটক, সেই মানুষই ক্রমে হারিয়ে যেতে থাকে। মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা-কষ্ট-অসহায়তা থেকে নবনাট্যের একটা অংশ মুখ ঘুরিয়ে নেয়। যেন এগুলো বলার দায় গণনাট্যের, নবনাট্য এইসবের ঊর্ধ্বে। আর এই সবকিছুকেই 'নবনাট্য'-এর মোড়কে চালানোর চেষ্টা চলতে থাকে।[১২৪] যে কারণে মনোরঞ্জন বিশ্বাস নবনাট্য আন্দোলনকে 'একটি শূন্যতা—দর্শনহীনতা' বলে উল্লেখ করেছেন।[১২৫] শম্ভু মিত্রও এক সময়ে 'নবনাট্য' ধারণার বিশৃঙ্খলায় ক্লান্তবোধ করেছিলেন। থিয়েটারের কাজ কী, কীভাবে থিয়েটার নির্মিত হবে এই বিষয়গুলো নিয়ে তাঁকে আবার কলম ধরতে হয়।[১২৬] এমনকি একটা সময়ে সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় ছদ্মনামে শম্ভু মিত্র অত্যন্ত ক্লান্তস্বরেই লিখেছেন 'নব-নাট্য আন্দোলন—এ নামের শেষ হোক'। যেখানে তিনি লিখেছেন,

> "নতুন বাচনভঙ্গী, স্বর প্রক্ষেপণের নবতর কারুকার্য কিংবা অভিনয়ে কোনও নব ডাইমেনশন কোথাও দেখি না। সবই সেই পুরাতন কপিবুক থেকে ছিঁড়ে আনা দাগানো হরফ। সবই সেই আবেগভিত্তিক এক বুদ্ধিহীন অভিনয় ধারা।"[১২৭]

স্পষ্টতই রাজনৈতিক আদর্শের অতিরেক ও পুনরাবৃত্তি যেমন গণনাট্যকে একমুখীন করে তুলেছে, তেমনই চর্বিতচর্বণ নবনাট্য আন্দোলনের ক্ষতি করেছে।

গণনাট্যের ক্ষেত্রে তবু যুক্তি আছে যে বাংলা নাট্য-আন্দোলনের মূল কেন্দ্র থেকে সরে এলেও তাঁদের আদর্শগত অভিপ্রায় বদলায়নি। পার্টির চোখ দিয়ে হলেও তাঁরা মানুষকে দেখেছে, তাঁদের কথা বলার চেষ্টা করেছে। রাষ্ট্রের আঘাত সহ্য করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য পালন করেছে। কিন্তু বৃহত্তর নবনাট্য খুব দ্রুত মানুষের প্রতি দায়িত্বপালনের পথ থেকে সরে এসেছিল। শম্ভু মিত্র রাজনৈতিক দলের ভেঁপুদার চাননি, চাননি যে নাটক 'সিভিল ওয়ার' ঘটায় তাকে মঞ্চস্থ করতে। কিন্তু তাঁকেও সাতের দশকে দাঁড়িয়ে লিখতে হয়,

> "তখন কোন সাহসে নাটককার সত্য কথা লিখবে, কোন সাহসে অভিনেতারা সেটা অভিনয় করবে? যদি বিপদ আসে কে তাদের পাশে এসে দাঁড়াবে?"[১২৮]

তাঁর প্রচ্ছন্ন আক্রমণের লক্ষ্য নকশালরা, কিন্তু কীভাবে তিনি রাষ্ট্রের দায় এড়িয়ে যান? 'সৎনাট্য'-এর ধ্বজা উড়িয়ে কি রাষ্ট্রের অন্যায় থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখা সম্ভব? তথাকথিত নবনাট্যের কিছু দল সাতের দশকের দুর্বিষহ পরিস্থিতিকে তুলে ধরতে পেরেছিল, কিন্তু অধিকাংশ দলই হয় নীরব ছিল, নয়তো উদ্দেশ্যহীন 'শিল্প'-এর সেবা করে গেছে।

১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় আসীন হয়। রাজনৈতিক অবস্থাও স্থিতিশীল হয়ে আসে। গণনাট্য সংঘ পার্টির আরও গভীরে সিঁধিয়ে বসে, বৃহত্তর গণনাট্য আন্দোলনের শিল্পীদের অনেকে সরকারের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েন। সাতের দশকে নবনাট্যের নিস্পৃহ ভূমিকাও পীড়াদায়ক ছিল। দুয়ের দুর্বলতার মধ্যেই গ্রুপ থিয়েটারগুলি আরও বিকশিত হতে শুরু করে, যার মধ্যে উভয় আন্দোলনেরই মিশ্রণ ঘটেছিল। 'গণনাট্য বনাম নবনাট্য' বিতর্কও দৈনন্দিন বিতর্কের থেকে ক্রমে ইতিহাসচর্চার বিষয় হয়ে ওঠে।

গণনাট্য সংঘের সংগঠন ও নাট্যচর্চায় 'শিল্প-রাজনীতির দ্বন্দ্ব' আলোচনার পর স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে গণনাট্য সংঘের নাট্যচিন্তা ও প্রযোজনার ধরণ কি বাংলা নাটকের ইতিহাসে শুধুই একপেশে ব্যর্থতার সাক্ষী? আদর্শগত দৃঢ়তা ছাড়া কি গণনাট্য আর নতুন কিছু প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি? কিছু বিচ্ছিন্ন নাটক ছাড়া কি গণনাট্যের কোনো সাফল্য নেই? না। গণনাট্য সংঘ বাংলা নাটককে নতুন পথ দেখিয়েছে, সেই পথে চলার সাহস দেখিয়েছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে গণনাট্য সংঘ প্রদর্শিত আন্দোলনের পথ ধরেই বাংলা নাটক বহুধারায় বিভক্ত হয়ে আজকের রূপ পেয়েছে। গণনাট্য সংঘের নাট্যপ্রযোজনা বাংলা নাটককে অর্থনৈতিক চেতনায় স্বাচ্ছন্দ্য করে তুলেছে, রাজনৈতিক-সামাজিক সমস্যাকে নতুন রূপ দিয়েছে। যার ফলে বাংলা নাটকের পরিধি বেড়েছে। নাটকের প্রগতিশীল বক্তব্য গ্রামে-গ্রামে ছড়িয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছে। সেই দায়িত্ব নিয়েছে বলেই সাফল্য-ব্যর্থতা তার সঙ্গী হয়েছে। আপশোশ এটাই যে গণনাট্যের ব্যর্থতার জন্য সংঘের নাট্যচেতনা ও নাট্যপ্রয়োগের সংকীর্ণতার চেয়েও বেশি দায়ী বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের ঘটনাবলির দুর্বিপাক। ঘটনাচক্রে গণনাট্য সংঘ যে রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী ছিল, সেই পার্টিই দীর্ঘদিন বাংলার রাজনৈতিক ক্ষমতায় ছিল। অথচ তা সত্ত্বেও গণনাট্যের ক্ষয়রোগ আটকানো যায়নি। গণনাট্যের অন্যতম সক্রিয় সদস্য দিলীপ ঘোষালের বক্তব্যে তার কারণ খুঁজে পাওয়া যেতে পারে,

> "তাহলে গোলমাল একটা ছিল এবং তা মতাদর্শে নয়। মার্কসীয় বিশ্বদর্শনে নয়, দ্বন্দ্বতত্ত্বে নয়, শ্রেণি সংগ্রামের ঐতিহাসিক তত্ত্বে নয়। গোলমাল ছিল প্রয়োগে। পার্টি আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল মানুষকে, আবার নেতৃত্ব আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল পার্টিকে। মানুষের অভাবে একদিন প্রাণ গেল শুকিয়ে আমলাদের গড়া পাঁচিলের ওপারে। ফলে পাঁচিলের বাইরের মানুষের পুঞ্জিভূত বিক্ষোভকে পুঁজি করে প্রতিক্রিয়া যে আঘাত হানল তাকে প্রতিরোধ করা গেল না মানুষের অভাবে।"[১২৯]

কথাটা সম্ভবত রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসেও ব্যাপকভাবে সত্যি।

তথ্যসূত্র :

১। চিন্মোহন সেহানবীশ; ৪৬ নং—একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে, সেরিবান, কলকাতা, ২০১৫, পৃ- ১৪৬

২। সজল রায়চৌধুরী; ৬৪ পূর্ববর্তীকালের সৃষ্ট গণনাট্যের নাটক : রচনা ও প্রযোজনার বৈশিষ্ট্য, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, (সম্পাদনা- বাবলু দাশগুপ্ত ও শিবশর্মা), গণনাট্য সংঘ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, ১৯৯৩, পৃ- ১৬৭

৩। হেমাঙ্গ বিশ্বাস; গণনাট্য সংঘ বনাম গণনাট্য আন্দোলন, উজান গাঙ বাইয়া, অনুষ্টুপ, ২০১৮, পৃ- ১৩৮

৪। Sudhi Pradhan (Editor); Marxist Cultural Movement in India (MCMI), Vol. 1, National Book Agency, Calcutta, 1985, পৃ- XVIII

৫। চিত্তরঞ্জন ঘোষ; নাটক 'নবান্ন', নবান্ন, বিজন ভট্টাচার্য, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪, পৃ- ১৪১

৬। সুধী প্রধান; গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাট্যকথা, পুস্তক বিপণি, ১৯৯২, পৃ- ৭৩

৭। তদেব, পৃ- ৭৩

৮। অমলেন্দু সেনগুপ্ত; উত্তাল চল্লিশ অসমাপ্ত বিপ্লব, প্রতিভাস, ২০০৬, পৃ- ৬১

৯। সজল রায়চৌধুরী; গণনাট্য কথা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৯৮

১০। প্রাগুক্ত, গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাট্যকথা, পৃ- ৬৪

১১। প্রাগুক্ত, Marxist Cultural Movement in India (MCMI), Vol. 1, পৃ- ২৯৫

১২। প্রাগুক্ত, গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাট্যকথা, পৃ- ৬৬

১৩। তদেব, পৃ- ৬৭

১৪। তদেব, পৃ- ৭০

১৫। তদেব, পৃ- ৭০

১৬। তদেব, পৃ- ৭১

১৭। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা, ইম্প্রেসন সিন্ডিকেট, ১৯৭৮, পৃ- ৩৫৩

১৮। মৃত্যুঞ্জয় অধিকারী; গণনাট্য সংগঠন ১, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক ২ (সম্পাদনা- ধনঞ্জয় দাশ), নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ, পৃ- ২২৭-২২৮

১৯। সুনীল দত্ত; গণনাট্য সঙ্ঘ বাস্তুভিটা, নাট্য আন্দোলনের তিরিশ বছর (সম্পাদনা- সুনীল দত্ত), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৮৭, পৃ- ৩২

২০। ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদনা); মার্কসীয় সাহিত্য সমালোচনার সমস্যা, নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, ১৯৫৭, পৃ- ২০৬

২১। হেমাঙ্গ বিশ্বাস; অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রন্টের স্বরূপ ও সমস্যা, তিন দশকের গণআন্দোলন (সম্পাদনা- অনিল আচার্য), অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০১৮, পৃ- ৩২-৩৩

২২। প্রাগুক্ত, শিল্প সাহিত্যের সমস্যা : চিনের পথ, ৪৬ নং—একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন প্রসঙ্গে, পৃ- ৮১

২৩। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); সংকীর্ণতাবাদী হঠকারী লাইনের বিরুদ্ধে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কমিটির আত্মসমালোচনা, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯, পৃ- ২০৭

২৪। প্রাগুক্ত, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়; নবনাট্য আন্দোলনের সংকট, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক ২, পৃ- ২৩৯

২৫। সুরমা ঘটক; ঋত্বিক পদ্মা থেকে তিতাস, অনুষ্টুপ, জানুয়ারি, ২০১০, পৃ- ১৮৫

২৬। প্রাগুক্ত, নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা, পৃ- ৩৫৮

২৭। প্রাগুক্ত, তিন দশকের গণআন্দোলন, পৃ- ৩৮

২৮। প্রাগুক্ত, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ২১২

২৯। প্রাগুক্ত, নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা, পৃ- ৩৫৩

৩০। প্রাগুক্ত, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ- ২০৭

৩১। তদেব, পৃ- ২০৮

৩২। প্রাগুক্ত, ঋত্বিক পদ্মা থেকে তিতাস, পৃ- ১৮৫

৩৩। সুনীল দত্ত; স্রোতের বিরুদ্ধে ঋত্বিক, নাট্যস্মৃতি : পঞ্চাশ বছর, প্রথম পর্ব, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৬, পৃ- ৬৩

৩৪। প্রাগুক্ত, ঋত্বিক পদ্মা থেকে তিতাস, পৃ- ৫৮

৩৫। সুধী প্রধান; গণনাট্য আন্দোলনের ঐতিহ্য, গণনাট্য পত্রিকা, প্রথম বর্ষ, শারদীয় সংকলন, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১১০

৩৬। ঋত্বিক ঘটক; অন দ্য কালচারাল ফ্রন্ট, (অনুবাদ- রথীন চক্রবর্তী), নাট্যচিন্তা, ২০০৩, পৃ- ২১

৩৭। প্রাগুক্ত, 'আই.পি.টি.এ-র কি প্রয়োজন আছে?', গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ২৪৬-২৪৭

৩৮। তদেব, পৃ- ২৪৬

৩৯। শ্যামল চক্রবর্তী; ৬০-৭০ ছাত্র আন্দোলন, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১, পৃ- ৬৬

৪০। শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়; গণনাট্য : সেকাল একাল, প্রসঙ্গ গণনাট্য, গণমন প্রকাশন, ২০০০, পৃ- ১৬০

৪১। প্রাগুক্ত, গণনাট্য সংঘ ও আত্মকথা, উজান গাঙ বাইয়া, পৃ- ১৩০

৪২। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); পশ্চিমবঙ্গ অষ্টম রাজ্য সম্মেলন, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৮, পৃ- ৫৫২

৪৩। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ১৮৭

৪৪। প্রাগুক্ত, অন দ্য কালচারাল ফ্রন্ট, পৃ- ২২-২৩

৪৫। প্রাগুক্ত, গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাট্যকথা, পৃ- ১২৬

৪৬। প্রাগুক্ত, হেমাঙ্গ বিশ্বাস-কল্পনা বিশ্বাস সাক্ষাৎকার, উজান গাঙ বাইয়া, পৃ- ২৬১

৪৭। প্রাগুক্ত, নবপর্যায়ে গণনাট্য আন্দোলন : একটি সমীক্ষা, প্রসঙ্গ গণনাট্য, পৃ- ২০

৪৮। সলিল সেন; নবনাট্যের সংজ্ঞা, আজকের নাটক ও নবনাট্য আন্দোলন (সম্পাদনা- সুনীল দত্ত), জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, পৃ- ৩৬

৪৯। প্রাগুক্ত, নবপর্যায়ে গণনাট্য আন্দোলন : একটি সমীক্ষা, প্রসঙ্গ গণনাট্য, পৃ- ২২

৫০। পবিত্র সরকার; কলকাতার গ্রুপ থিয়েটার, নাটমঞ্চ নাট্যরূপ, অখণ্ড সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃ- ৩০৭

৫১। রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য; মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব, অবভাস, জানুয়ারি ২০১৭, পৃ- ১০১

৫২। সজল রায়চৌধুরী; সংঘ কথা, রাজ্য নাট্যোৎসবের নাট্যপত্রী, এপ্রিল ১৯৬১

৫৩। আন্তোনিও গ্রামশি; বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষা (সম্পাদনা ও অনুবাদ- শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৌরীন ভট্টাচার্য), অনুষ্টুপ, ২০২১, পৃ- ৪৪

৫৪। মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত (সম্পাদনা); অজয় ঘোষের সঙ্গে স্ট্যালিনের সাক্ষাৎকার, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, ষষ্ঠ খণ্ড, মনীষা, সেপ্টেম্বর ২০১০, পৃ- ৩৮৬

৫৫। প্রাগুক্ত, অপ-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সাংস্কৃতিক যুক্তফ্রন্টের স্বরূপ ও সমস্যা, তিন দশকের গণআন্দোলন, পৃ- ৩৪

৫৬। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; 'গণনাট্যে পুরনো দিনের দুর্বলতার ভূতটাই ঘুরপাক খাচ্ছে', আনন্দলোক, ১৪ এপ্রিল ১৯৯০

৫৭। সুধী প্রধান; 'তুলসীদা বেঁচে থাকলে ফরমুলা নাটক থেকে আমাদের নাট্যজগৎ মুক্ত হত', সাগর বিশ্বাস কর্তৃক গৃহীত সাক্ষাৎকার, তথ্যকেন্দ্র, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮, পৃ- ৮৪

৫৮। সৌমিত্র বসু; স্বাধীনতা উত্তর বাংলা নাট্য প্রয়োগের ধারা, নাট্য আকাদেমি পত্রিকা ৬, পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি, মার্চ ১৯৯৯, পৃ- ১৬১, ১৬৫

৫৯। রথীন চক্রবর্তী; গননাট্য আন্দোলনের ইস্তাহার, পিপলস থিয়েটার, রম্যাঁ রলাঁ (অনুবাদ ও সম্পাদনা- রথীন চক্রবর্তী), পুস্তক বিপণি, পৃ- ১৪

৬০। প্রাগুক্ত, মার্কসীয় নন্দনতত্ত্ব, পৃ- ১১৫

৬১। মাও জে দং; সাহিত্য ও শিল্প প্রসঙ্গে ইয়েনানের আলোচনা সভায় প্রদত্ত ভাষণ, মাও জে দং রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, নবজাতক প্রকাশন, ১৯৬০, পৃ- ১১৭

৬২। লুই আরাগঁ; নতুন চোখে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ, পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৬৬, পৃ- ৪৮০

৬৩। প্রাগুক্ত, উৎপল দত্ত; গণনাট্য আন্দোলনে নাটকের সমস্যা, নাট্য আন্দোলনের তিরিশ বছর, পৃ- ৫৪

৬৪। প্রাগুক্ত, নাট্যচিন্তা শিল্পজিজ্ঞাসা, পৃ- ৪০৪

৬৫। প্রাগুক্ত, গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাট্যকথা, পৃ- ১৭

৬৬। উৎপল দত্ত; ধর্মতলার হ্যামলেট, গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৫, পৃ- ১৩৩-১৩৪

৬৭।

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1888/letters/88_04_15.htm

৬৮। হীরেন ভট্টাচার্য; ইতিহাসের ধারা ও গণনাট্য, গণনাট্য পত্রিকা, জুলাই ১৯৭২, পৃ- ৪৬

৬৯। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র; মার্কসীয় আর্টতত্ত্ব ও লেখকের স্বাধীনতা, পরিচয়, বৈশাখ ১৩৬৬, পৃ- ৭৫৯

৭০। প্রাগুক্ত, ইতিহাসের ধারা ও গণনাট্য, পৃ- ৪৪

৭১। প্রাগুক্ত, বিজন ভট্টাচার্য; 'নবান্ন'-এর নাট্যকারের প্রতিবেদন, নবান্ন, পৃ- ১২৩

৭২। প্রাগুক্ত, গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাট্যকথা, পৃ- ২

৭৩। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ৭২-৭৩

৭৪। প্রাগুক্ত, পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ, বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, তৃতীয় খণ্ড, পৃ- ৬৩২

৭৫। অঞ্জন বেরা; পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ : পর্ব থেকে পর্বান্তর, গণনাট্য প্রকাশনী, ২০১৭, পৃ- ৮২

৭৬। অনিল ঘোষ; নয়ানপুর, গণনাট্য পত্রিকা, ৪৮ বর্ষ, মার্চ-এপ্রিল ২০১১, পৃ- ১০২

৭৭। প্রাগুক্ত, বিধানসভার কার্যবিবরণী, ১০ নভেম্বর ১৯৫৩, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ২৪৩-২৪৫

৭৮। তদেব, পৃ- ২৪৩-২৪৬

৭৯। তদেব, পৃ- ২৪৩

৮০। প্রাগুক্ত, গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাট্যকথা, পৃ- ২

৮১। মঞ্জুকুমার মজুমদার ও ভানুদেব দত্ত (সম্পাদনা); বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধান, দ্বাদশ খণ্ড, মনীষা, জানুয়ারি ২০১৪, পৃ- ৭০১

৮২। তদেব, পৃ- ৭০১-৭০২

৮৩। তদেব, পৃ- ৭১৪

৮৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বাতায়নিকের পত্র, কালান্তর, বিশ্বভারতী, আষাঢ় ১৪২২, পৃ- ১৩৪

৮৫। বিজন ভট্টাচার্য; গণনাট্য আন্দোলনে সেকাল ও একাল, বিজন ভট্টাচার্য : বাংলা থিয়েটার আন্দোলন, গন্ধর্ব, ক্রমিক সংকলন ৩০, আশ্বিন ১৩৮৪, পৃ- ৮৩

৮৬। নৃপেন্দ্র সাহা; সমষ্টি ও ব্যষ্টির দ্বান্দ্বিকতায় শম্ভু মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ, শম্ভু মিত্র সংখ্যা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ পৃ- ৩১

৮৭। ড. স্বাতী লাহিড়ী; গ্রুপ থিয়েটারের উৎস সন্ধানে, জাতীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৫, পৃ- ৫৭

৮৮। প্রাগুক্ত, গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাট্যকথা, পৃ- ৭৩

৮৯। প্রাগুক্ত, সমষ্টি ও ব্যষ্টির দ্বান্দ্বিকতায় শম্ভু মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ, শম্ভু মিত্র সংখ্যা, পৃ- ৩৮

৯০। শাঁওলী মিত্র; তর্পণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৯৮, পৃ- ২২, ২৪

৯১। শম্ভু মিত্র; নিবারণ পণ্ডিত, সন্মার্গ সপর্যা, এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪২০ বঙ্গাব্দ, পৃ- ১

৯২। তদেব, পৃ- ১

৯৩। প্রাগুক্ত, বটুকদা বিজন ও আমি, সন্মার্গ সপর্যা, পৃ- ২০১

৯৪। প্রাগুক্ত, একত্র অথচ স্বাধীন হওয়ার সভ্যতা, সন্মার্গ সপর্যা, পৃ- ১২৬

৯৫। প্রাগুক্ত, সমষ্টি ও ব্যষ্টির দ্বান্দ্বিকতায় শম্ভু মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ, শম্ভু মিত্র সংখ্যা, পৃ- ৪০

৯৬। প্রাগুক্ত, গণনাট্য আন্দোলনে সেকাল ও একাল, বিজন ভট্টাচার্য : বাংলা থিয়েটার আন্দোলন, গন্ধর্ব, পৃ- ৭৯

৯৭। তদেব, পৃ- ৮৯

৯৮। প্রাগুক্ত, বিজন ভট্টাচার্য; 'নবান্ন'-এর নাট্যকারের প্রতিবেদন, নবান্ন, পৃ- ১২৪

৯৯। অনিল বিশ্বাস (সম্পাদনা); বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন : দলিল ও প্রাসঙ্গিক তথ্য, প্রথম খণ্ড, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৯, পৃ- ৭৫, ৭৭

১০০। প্রাগুক্ত, গণনাট্য আন্দোলনে সেকাল ও একাল, বিজন ভট্টাচার্য : বাংলা থিয়েটার আন্দোলন, গন্ধর্ব, পৃ- ৮২

১০১। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ৯২

১০২। প্রাগুক্ত, গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাট্যকথা, পৃ- ২৬-২৭

১০৩। প্রাগুক্ত, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক ২, পৃ- একান্ন

১০৪। প্রাগুক্ত, অন দ্য কালচারাল ফ্রন্ট, পৃ- ৯৬

১০৫। তদেব, পৃ- ১১০

১০৬। প্রাগুক্ত, স্রোতের বিরুদ্ধে ঋত্বিক, নাট্যস্মৃতি : পঞ্চাশ বছর, প্রথম পর্ব, পৃ- ৬৬

১০৭। প্রাগুক্ত, অন দ্য কালচারাল ফ্রন্ট, পৃ- ১০৮

১০৮। তদেব, পৃ- ৬৪

১০৯। তদেব, পৃ- ২৯

১১০। প্রাগুক্ত, ঋত্বিক পদ্মা থেকে তিতাস, পৃ- ১৫৯

১১১। প্রাগুক্ত, উমানাথ ভট্টাচার্য; কেন নাটক? কার জন্য নাটক?, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ১০১

১১২। প্রাগুক্ত, গণনাট্য কথা, পৃ- ৩৬

১১৩। সাক্ষাৎকার ১, নির্বাচিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যচিন্তা, ২০০৬, পৃ- ১৩২

১১৪। তদেব, পৃ- ১৩২

১১৫। প্রাগুক্ত, গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাট্যকথা, পৃ- ২৬

১১৬। প্রাগুক্ত, সমস্যার একটা দিক, সন্মার্গ সপর্যা, পৃ- ২৩

১১৭। ঘরোয়া, বহুরূপী ১০, নভেম্বর ১৯৬০

১১৮। প্রাগুক্ত, দিগিন বন্দ্যোপাধ্যায়; নবনাট্য আন্দোলনের সংকট, মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক ২, পৃ- ২৩৯

১১৯। প্রাগুক্ত, গণ-নব-সৎ-গোষ্ঠী নাট্যকথা, পৃ- ১৬

১২০। প্রাগুক্ত, কীভাবে রবীন্দ্রনাথে পৌঁছানো গেল, সন্মার্গ সপর্যা, পৃ- ১৭৬

১২১। গোপাল হালদার; সংস্কৃতি সংবাদ, পরিচয়, ফাল্গুন ১৩৬৮, পৃ- ৮৬৮

১২২। প্রাগুক্ত, একটি আলোচনা, সন্মার্গ সপর্যা, পৃ- ৬৪

১২৩। প্রাগুক্ত, একত্র অথচ স্বাধীন হওয়ার সভ্যতা, সন্মার্গ সপর্যা, পৃ- ১২৬

১২৪। প্রাগুক্ত, নবনাট্যের সংজ্ঞা, আজকের নাটক ও নবনাট্য আন্দোলন, পৃ- ৩০

১২৫। তদেব, পৃ- ৩৩

১২৬। প্রাগুক্ত, একটি আলোচনা, সন্মার্গ সপর্যা, পৃ- ৬৪

১২৭। সুরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়; 'নব-নাট্য আন্দোলন'—এ নামের শেষ হোক, বহুরূপী, চতুর্দশ বিশেষ সংখ্যা, ১৯৬২, পৃ- ৪০

১২৮। প্রাগুক্ত, ব্রাত্যের স্বপ্ন, সন্মার্গ সপর্যা, পৃ- ১৫২

১২৯। প্রাগুক্ত, দিলীপ ঘোষাল; গণনাট্য কর্মীর আত্মজিজ্ঞাসা, গণনাট্য : পঞ্চাশ বছর, পৃ- ১৮০